মজার এক্সপেরিমেন্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

মজার এক্সপেরিমেণ্ট

এতে আছেঃ

চৈতি (তমালী বসু)-কে

বড় হয়ে মজার এক্সপেরিমেণ্টগুলো

করবার জন্য—

কাকু

এই লেখকের অন্যান্য বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা
রসায়নের ভেল্‌কি
ম্যাজিকের মত মজা
তত সহজ ছিল না
পদার্থ বিজ্ঞানের খোশখবর
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা

মজার এক্সপেরিমেণ্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৭৯ সপ্তম মুদ্রণ জুলাই ১৯৮৮

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বিপুল গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৬·০০

বাতাস

সারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে বায়ুমণ্ডল। বায়ুর তীব্রতা অনুসারে আমরা তাকে ঝড়, বায়ু, বাতাস, সমীরণ ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকি।

বাতাস আমাদের চারদিকেই রয়েছে। এর থেকেই আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলছে এবং আমরা বেঁচে আছি। বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাইনে কিন্তু এর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি। পৃথিবীতে বাতাস না থাকলে দিনের বেলায় খুব গরম লাগত আর রাত্তিরে হতো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

বাতাস যদিও খুব হাল্কা—তবুও বাতাসের ওজন আছে।

ঘরের মধ্যে যে বাতাস আছে তা আমরা বুঝতে পারিনে মোটেই! কেন বলো তো? কারণ বাতাস সর্বত্র আছে এবং সব দিক থেকে আমাদের চাপ দিচ্ছে। এটা না হয়ে যদি বাতাস কেবল একদিক দিয়েই চাপ দিত—তাহলে আমরা সেটা টের পেতাম সহজেই! বাতাসের চাপ যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায় তার নাম ব্যারোমিটার। বাতাস দ্রুত প্রবাহিত হলে আমরা তাকে বায়ু-প্রবাহ বলে থাকি। এই দ্রুত প্রবাহিত বায়ুর সাহায্যে উইণ্ডমিল চলে। উইণ্ডমিলের পাখ্‌নাকে ঘুরিয়ে দেয় ঝোড়ো বাতাস আর তার ফলে গম পেষাই ও অন্যান্য অনেক কাজ করা যায়।

বাতাস কি দিয়ে তৈরী জানো? শুক্‌নো বাতাসের মধ্যে রয়েছে—

৭৮% নাইট্রোজেন

২১% অক্সিজেন

০·৭% আরগন (এক ধরণের নিষ্ক্রিয় গ্যাস, নিওন গ্যাসের মতো —বড় হলে এর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানবে)

০·৩% কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণত বাতাস ভিজে থাকে এবং তার মধ্যে শতকরা তিন ভাগ জলীয় বাষ্প থাকে।

অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। কোনও কিছু পুড়বার জন্যে বাতাস না হলে চলে না। বাতাসকে চাপ দিলে ওটা সংকুচিত হয়। ফুটবলের পাম্পারকে ঠেলা দিলেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।

বাতাসকে খু-উ-ব বেশী চাপ দিলে সেটা পরিণত হবে তরল পদার্থে। তরল বাতাস খুব ঠাণ্ডা। এটা দেখতে জলের মতোই এবং একে আরও ঠাণ্ডা করলে জমে বরফের মতো শক্তও হতে পারে। এটাকে খোলা জায়গায় রেখে দিলে তাড়াতাড়ি সাধারণ বাতাস হয়ে যাবে কিন্তু!

এবার এসো, বাতাস নিয়ে আমরা কয়েকটা মজার এক্সপেরিমেণ্ট করি।

ভর্তি জলের গেলাসকে উল্টিয়ে ধরা

তুমি একটি গেলাসকে কানায় কানায় জলে ভর্তি করে তার মুখটা একটা মোটা কাগজ অথবা কার্ডবোর্ড দিয়ে বেশ ভাল করে মুড়ে নাও। কাগজটির বেড়িয়ে থাকা অংশকে গেলাসের চারপাশে মুড়ে দিয়ে সাবধানে গেলাসটিকে উল্টিয়ে ধর। দেখবে তাজ্জব ব্যাপার—কাগজ থেকে হাত সরিয়ে নেবার পরেও গেলাসের এক ফোঁটা জলও বাইরে পড়ে যাচ্ছে না। আর তাছাড়া কাগজটিও কেমন ম্যাজিকের মতো গেলাসের মুখে শক্ত করে আটকে গেছে। কেমন করে এটা সম্ভব হচ্ছে বলতে পারো?

আসলে বাইরের বাতাস গেলাসের মুখের সাথে আটকানো

কাগজের উপর প্রায় ১৪½ পাউণ্ড চাপ দিচ্ছে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। যে শক্তিতে বাতাস কাগজের উপর চাপ দিচ্ছে তা গেলাসের ভিতরের জলকে অনায়াসেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে—অর্থাৎ বাতাসের এই চাপের জন্যেই ঐ জল মাটিতে পড়তে পারছে না।



কয়েকবার অভ্যেস করে নিলে গেলাসকে উল্টোবার সময় কাগজের উপর তোমার আঙুল রাখার দরকার হবে না। একসাথে কার্ড অথবা কাগজসুদ্ধ জলভর্তি গেলাসটাকে উল্টিয়ে ধরলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। গেলাসের মুখে ফিট করে এমন প্লাস্টিকের ছোট ঢাক্‌নী দিয়েও এটা ভাল ভাবে দেখানো চলে।

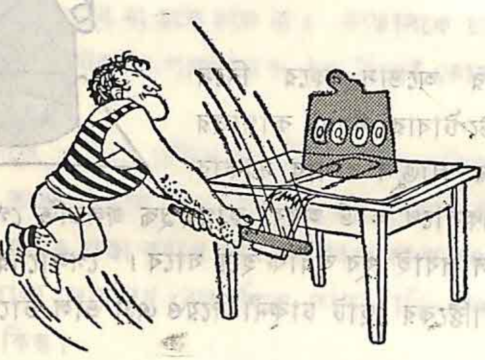
বাতাস কত ভারী !

বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—তবু বলছি, প্রায় ৪০০ পাউণ্ডের মতো ওজন তোমার হাতের উপর চাপ দিচ্ছে। শুধু এখানেই শেষ নয়—তোমার সারা দেহে চাপের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় বেশ কয়েক হাজার পাউণ্ড!—কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? আসলে মজাটা হচ্ছে, তুমি বুঝতেই পারছ না এত বেশী ওজনের চাপ যা তোমার দেহে চাপ দিচ্ছে, সেটা আসছে কোথা থেকে!

কে আবার এই চাপ দিচ্ছে—বাতাস ছাড়া? হ্যাঁ, এই হাল্‌কা বাতাসই কি অবিশ্বাস্য রকমের চাপ দেয় আমাদের সারা দেহে যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বাতাস আমাদের চাপ দিচ্ছে—প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গায় প্রায় ১৪½ পাউণ্ড। তার মানে বাতাসের এই চাপ একটা ছোট্ট স্ট্যাম্পের মতো জায়গার চেয়ে কিছুটা বেশী জায়গায় পড়ছে।

আমাদের একটা হাতের সারা জায়গায় এই রকম কতো বর্গ ইঞ্চি জায়গা ছড়িয়ে আছে। তাহলে ছ্যাখো, হাতের উপরে এই রকম কতো বেশি পরিমাণ ওজনের চাপ পড়ছে। কিন্তু মজার কথা, বাতাস হাতের সব দিকেই চাপ দিচ্ছে; এছাড়া হাতটারও তো উল্টোমুখো চাপ রয়েছে। তাই সত্যি সত্যি আমরা বাতাস যে চাপ দিচ্ছে তা টের পাই না।



বাতাসের চাপ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করে তা সহজেই বুঝান যায়। টেবিলের উপর একটা পাতলা পিচবোর্ড (৪″ × ২০″) ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই-ভাবে একটা খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও। লক্ষ্য রাখবে, কাগজটার যেন কোনও ক্ষতি না হয় অথবা কোথাও যেন ফুটো না থাকে। পিচবোর্ডের যে অংশটা টেবিলের বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকবে সেটা টান টান করে নাও। এবার বোর্ডের ঐ বেরিয়ে থাকা জায়গায় নীচে থেকে উপরে অথবা উপর থেকে নীচে যতো জোরে পার ঘুষি চালাতে থাকো। দেখবে অবাক কাণ্ড, খবরের কাগজের কিছুই হচ্ছে না—এমন কি ওটা বাতাসের উপরের দিকেও উঠবে না! তোমার যতো খুশী ইচ্ছে ঘুষি লাগাও, যতো জোরে পারো, (এত জোরে যে কোনও লোকের মুখে একবার পড়লে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হতে পারে) তবুও কাগজটার কিছুই হবে না। ঘুষি না মেরে তুমি অবশ্য একটা পাতলা স্কেল দিয়েও ওটার উপর আঘাত

করতে পারো। এক্ষেত্রেও অবাক করা ব্যাপার ঘটাও বিচিত্র নয়—স্কেলটা ভেঙ্গে যেতে পারে খানিক বাদে—কিন্তু কাগজটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই থাকবে। তুমি ঐ কাগজটার স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারবে না মোটেই!

এই অসম্ভব কাণ্ডটা কেন হচ্ছে—তা বলতে পার? খবরের কাগজটা মোটামুটি ৩৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ২৫ ইঞ্চি চওড়া। তাহলে এর আয়তন হচ্ছে প্রায় ৮৫০ বর্গ ইঞ্চি। এখন এর উপর বাতাসের চাপ কতো তা চোখ বুজে বলতে পারো? আসলে এই কাগজের উপর বাতাসের চাপের পরিমাণ হচ্ছে—১২,৩২৫ পাউণ্ড! ভাবতে পারা যায়? আচ্ছা, একবার অঙ্ক কষে ছ্যাখই না!

মজার ব্যারোমিটার ও পাখীর ঝরণা

ব্যারোমিটার কি তোমরা নিশ্চয়ই তা জানো। ব্যারোমিটার যন্ত্র দিয়ে বাতাসের চাপ মাপা যায়। এস, আমরা একটা ছোট্ট ব্যারোমিটার এবং সেই সাথে পাখীর জল খাবার ঝরণা বানাই।



দুধের বোতল অথবা ঐ ধরণের একটা শিশি নিয়ে তার তিন ভাগ

জলে ভর্তি কর। এইবার বোতলটাকে উল্টিয়ে একটা কাঁধ উঁচু থালার (যার মধ্যে আগে থেকেই কিছুটা জল ছিল) উপর রাখ, যেন বোতলের মুখটা জলের নীচে থাকতে পারে।

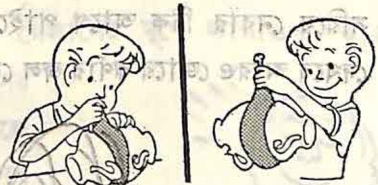
বোতলের বাইরে একটা কাগজ সেঁটে নিয়ে ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে সেই রকম দাগ দাও। যে জিনিষটা তৈরি হ'ল সেটা হচ্ছে একটি অতি সাধারণ ব্যারোমিটার।

বাতাসের চাপ বেশি থাকলে সাধারণত আবহাওয়া ভাল থাকে। এক্ষেত্রে বোতলের জলটা উপরে উঠবে। বাতাসের চাপ কম থাকলে বোতলের জল বেশী উপরে উঠবে না। এখানে আবহাওয়া যে খারাপ হতে পারে তার একটা আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। বোতলের ভিতরে জলের এই উঠানামা খুব বেশী পরিমাণে হয় না। তাছাড়া উষ্ণতার তারতম্য ঘটলে বোতলের বাতাস বাড়তে অথবা কমতে পারে। তাই এই ব্যারোমিটারকে এমন জায়গায় রাখা দরকার যেখানে উষ্ণতার তারতম্য হবে খুবই কম। এজন্যে ওটাকে সিঁড়ির নীচে অথবা নীচের দিকের কোনও ঘরে রাখাই সুবিধা।

তোমার তৈরী এই সুন্দর ব্যারোমিটারকে বাইরে এনে রাখলে তার ধারে কাছে এসে পাখীরা ভীড় করবে। না, না—বাতাসের চাপের কতো হেরফের হচ্ছে অথবা দিনটা কেমন যাবে তা জানবার জন্যে নয়। তৃষ্ণার্ত পাখীর দল স্রেফ জল খাবার জন্যেই তোমার ব্যারোমিটারের কাছে ছুটে আসবে। পাখীর এই জলখাওয়া পর্যবেক্ষণ করবেন যিনি, তিনি যে বেজায় মজা পাবেন—তাতে সন্দেহ নেই। কেন বলো তো ? ঝর্ণায় যেমন সব সময় অবিশ্রান্ত ধারায় জল পড়েই চলে ঠিক তেমনি এই ব্যারোমিটারের থালাতেও জল বেরুতে থাকবে। পাখীরা থালা থেকে জল খেয়ে শেষ করলে বোতল থেকে আপনা-আপনি জল বেরিয়ে এসে আবার তা পূরণ করবে। কেন বলো তো ? বাতাসের চাপের বেশ-কমের ফলেই এই কাণ্ড, আবার কি !

ম্যাজিক কাপ

ডিংকুকে ওর মা বললেন—চা খাবো, ছুটো কাপ নিয়ে এসো তো! ডিংকুর স্বভাবই হচ্ছে, ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা। সে অমনি কোত্থেকে একটা বড় বেলুন জোগাড় করে নিয়ে এসে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে (কাপের হাতলে হাত না দিয়ে) কাপ ছুটোকে বেলুনের ছ'পাশে চেপে ফুলাতে লেগে গেল।



মা পাশের ঘর থেকে আবার ডাক দিলেন—ডিংকু, ছুটো কাপ আনতে এতক্ষণ সময় লাগছে!

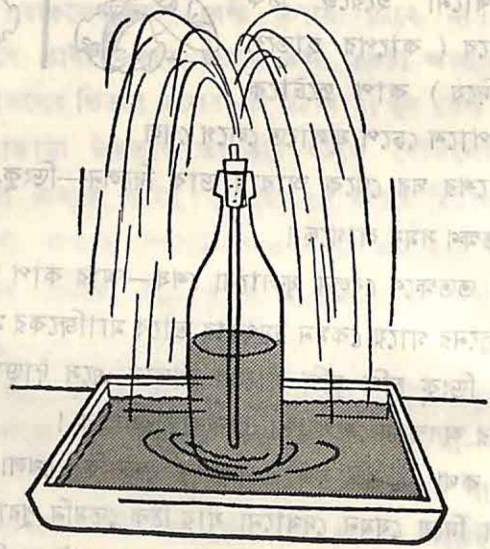
ডিংকুর ততক্ষণে বেলুন ফুলানো শেষ—আর কাপ ছুটোও—কি আশ্চর্য বেলুনের গায়ে কেমন চমৎকার ভাবে ম্যাজিকের মতো আটকে গিয়েছে। ডিংকু চুপি চুপি মায়ের পিছনে এসে দাঁড়াতেই ওর মা কাপ ছুটোর অবস্থান দেখে তো একেবারে অবাক!

একটা কথা। এই মজার কাপের ভেলকির খেলা নতুন এবং সুন্দর কাপ দিয়ে যেমন দেখানো যায় ঠিক তেমনি পুরানো কাপেও জমে বেশ। তোমরা তো খুব শান্ত ছেলে, তাই বলছিলাম প্রথম প্রথম পুরানো কাপ নিয়েই এই এক্সপেরিমেণ্ট করবে। পরে হাত পেকে গেলে সুন্দর নতুন কাপের খেলা দেখাবে, কেমন?

মজার ঝর্ণা

একটা বোতলের অর্ধেক জলে ভর্তি কর। বোতলের মুখে একটা ছিপি থাকবে। ঐ ছিপির মধ্যে ফুটো করে একটা সরবত খাবার

কাগজের পাইপ (স্ট্র) ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে আটকাও। পাইপটা যেন বোতলের বেশ নীচ পর্যন্ত চলে যায়। বোতলের ছিপিটাকে বেশ শক্ত করে আটকাতে হবে। এবার ঐ কাগজের পাইপের মধ্যে দিয়ে যত জোরে পার ফুঁ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখ ওখান থেকে সরিয়ে নাও। পাইপের মুখ দিয়ে সুন্দর ঝর্ণার মতো বেগে জল বেরুতে থাকবে। যদি তুমি ফুঁ দিয়ে মুখটা সরিয়ে নেবার ঠিক আগে পাইপের মুখটা একটু চেপে দাও তাহলে দেখবে আরও জোরে ঝর্ণার জল বেরিয়ে আসছে।



এই এক্সপেরিমেন্টের ব্যাখ্যাও অতি সাধারণ। তুমি যখন জোরে ফুঁ দিচ্ছ তখন জলের মধ্যেকার বাতাসের বুদ্বুদ বোতলের উপরের অংশে জমা হতে থাকে। স্পষ্টতই এখন বোতলের ভিতরের এই অংশে বাতাসের চাপ বাইরের বাতাসের চাপের চাইতে অনেক বেশী। যখন তুমি ফুঁ দেওয়া বন্ধ করলে তখন বোতলের চাপা বাতাস ঠেলা দিয়ে জলকে ঐ পাইপের বাইরে ফেলে দেবে। ভেতরের বাতাসের চাপ যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের বাতাসের চাপের সাথে এক না হচ্ছে ততক্ষণ ঝর্ণার মতো বেগে জল বেরুতে থাকবে।

আটকে গেল গেলাসটা !

এই মজার এক্সপেরিমেণ্টটা করতে হলে তোমার চাই—ছুটো কাঁচের গেলাস আর এই গ্লাসের মুখে ফিট করে এমন রবার রিং। রিংটাকে ভিজিয়ে নিয়ে একটা গেলাসের মুখে লাগাও। তারপর কিছু জ্বলন্ত কাগজ ঐ গেলাসের মধ্যে ফেলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গেলাসও উপুড় করে ঐ গেলাসের মুখে চেপে ধর। নীচের গেলাসের ভিতরের সব কাগজ পুড়ে গেলে গেলাস ছুটো চমৎকার আটকে যাবে। তুমি উপরের গেলাসে হাত দিয়ে



ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে নীচের গেলাসটিকে তুলতে পারো। বাইরের বাতাসের চাপ গেলাসের ভিতরের বাতাসের চাপের চাইতে বেশী থাকায় গেলাস ছুটি খুব সহজেই ম্যাজিকের মতো আটকে গেল !

খুব শক্ত কাঁচের গেলাস (যা পড়ে গেলে সহজে ভাঙবে না) অথবা পুরানো কাঁচের গেলাস ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো।

ফুঁ দিয়ে তুলতে পার ?

টেবিলের উপর সাজানো একগাদা ভারী বইকে যদি তুমি শুধু ফুঁ দিয়ে তুলতে পারো তবে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে—তাই না ? অবশ্য তোমার কথা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে চাইবে না।

চার-পাঁচ কিলো ওজনের বইকে কি শুধু ফুঁ দিয়ে ঠেলে তোলা সম্ভব ?

আচ্ছা এসো, এবার চেষ্টা করে দেখা যাক্। টেবিলের উপর একটা প্লাসটিকের ব্যাগ অথবা রবারের বালিশ (ট্রেণে বেড়াতে যাবার সময় ফুঁ দিয়ে যে বালিশ তৈরী করতে হয়) রাখ। তোমার কাছে যত ভারী ভারী বই আছে তা ছবিতে যেমন করে দেখানো হয়েছে সেইভাবে ঐ ব্যাগের উপর সাজাও। এইবার প্লাসটিক ব্যাগের

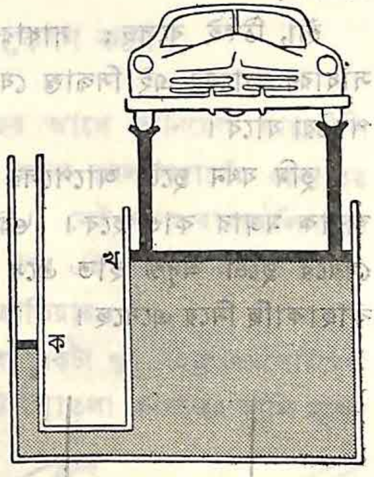


মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে থাক। দেখবে, অবাক কাণ্ড, অতো মোটা ভারী বইগুলো কেমন সুন্দর ভাবে উপরের দিকে উঠে আসছে! ব্যাগের মুখের ফুটোটা যেন খুব ছোট থাকে—সেদিকে খেয়াল রাখবে। প্লাসটিকের ব্যাগ অথবা রবারের বালিশ জোগাড় করতে না পারলে রবারের হট্ ব্যাগও ব্যবহার করে দেখতে পারো।

ব্যাগে ফুঁ দেবার সময় খেয়াল রাখবে যেন ঐ ভারী বই তোমার মাথায় অথবা ঘাড়ে এসে না পড়ে। তোমার ফুঁয়ের জোর আছে তা স্বীকার করছি—কিন্তু তোমার মাথার কি ঐ বইয়ের ভার সামলানোর ক্ষমতা আছে? কেমন করে এই ঘটনাটা ঘটছে তা বলতে পারো ?

বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাসকাল আবিষ্কার করেছিলেন, কোনও তরল

এবং গ্যাসীয় বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করলে তা সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যদি তোমার ফুঁয়ের জোর সামান্য বাড়ান হয়, ধরা যাক্‌: ১½ পাউণ্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চি বাড়ান হ'ল, তাহলে এই বল প্লাসটিক ব্যাগের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। যদি ব্যাগের আয়তন ৫" × ১০" অর্থাৎ পঞ্চাশ বর্গ ইঞ্চি হয় তাহলে তোমার ফুঁয়ের জোর হচ্ছে —৫০ × ১½ = ৭৫ পাউণ্ড।



তার মানে তুমি মাত্র ১½ পাউণ্ড জোরে ফুঁ-দিয়ে প্রায় ৭৫ পাউণ্ড ওজনের মালকে উপরে তুলতে পারলে।

হাইড্রোলিক প্রেস অথবা মোটরকার জ্যাকে এই তত্ত্বই কাজে লাগানো হয়। তুমি রবারের ব্যাগে যেমন ফুঁ দিয়ে বাতাস ভরেছিলে—এখানে অবশ্য তা করা হয় না। এখানে বাতাসের বদলে তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এবার দ্বিতীয় ছবিটার দিকে তাকাও। 'খ' পিস্টনের আয়তন যদি 'ক' পিস্টনের আয়তনের চাইতে হাজারগুণ বড় হয়—তাহলে 'ক' পিস্টনে মাত্র এক পাউণ্ড বলপ্রয়োগ করলেই সেটা 'খ' পিস্টনের উপরে রাখা ১০০০ পাউণ্ড ওজনের মালকে ঠেলে তুলবে!

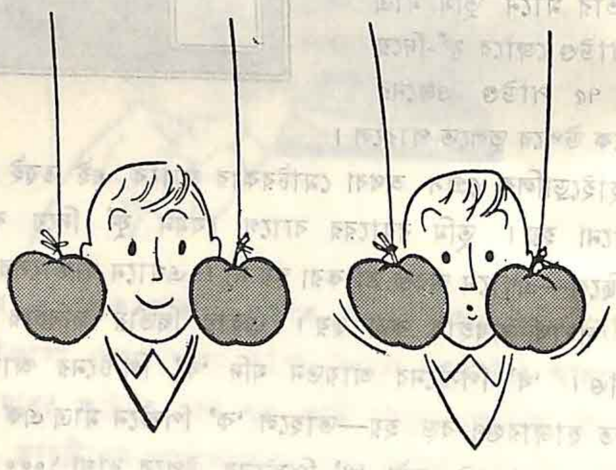
আপেলের মজার ভেল্‌কি

দুটো আপেল একগজ লম্বা সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। আপেল দুটোর মধ্যে দূরত্ব থাকবে মাত্র কয়েক ইঞ্চি। আচ্ছা, এবার যদি

তুমি দুটো আপেলের মাঝখান দিয়ে খুব জোরে ফুঁ দাও তাহলে কি হবে বলো তো? তারা বাতাসের ঠেলার জন্যে দূরে সরে যাবে—কি বল?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ; সাধারণ জ্ঞান এই কথাই বলে। তবু সাধারণ জ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত যে কত বড় ভুল তা একটু পরেই টের পাওয়া যাবে।

তুমি যখন দুটো আপেলের মাঝখান দিয়ে ফুঁ দিচ্ছ তখন এক অবাক মজার কাণ্ড হবে। ওরা দূরে তো সরে যাবেই না—উপরন্তু দেখবে দুটো অদৃশ্য হাত এসে আপেল দুটোকে কেমন আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।



এর কারণ কি বলতে পার? ডানিয়েল বারনৌলির সূত্র—আবার কি! বাতাসের গতিবেগ বাড়লে তার চাপ কমবে। যখন তুমি ফুঁ দিচ্ছ—তখন দুটো আপেলের মাঝখানের দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ আপেলের অন্যদিকের বাতাসের চাপের চাইতে কম থাকে। আপেলের অন্যদিকের বাতাস তখন সেটাকে কম চাপের জায়গায় ঠেলে দেবে। আর সেই জন্যেই আপেল দুটো দূরে সরে না গিয়ে খুব কাছাকাছি চলে আসবে।

এরোপ্লেন ওড়ে কেমন করে?

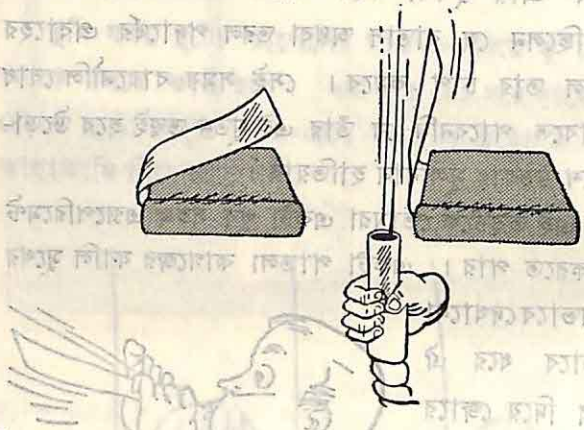
আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে ডানিয়েল বারনৌলি আবিষ্কার করেছিলেন যে বাতাস অথবা তরল পদার্থের প্রবাহের গতিবেগ বাড়লে তার চাপ কমবে। সেই সময় বারনৌলি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাঁর এই নূতন তত্ত্বই হবে উড়ো-জাহাজ আকাশে উড়বার মূল্যবান হাতিয়ার।

বারনৌলির এই তত্ত্বটিকে তোমরা একটা খুব সহজ এক্সপেরিমেন্ট করে যাচাই করতে পার। একটা পাতলা কাগজের ফালি মুখের কাছে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে ধরে ঐ কাগজের উপর দিয়ে জোরে ফুঁ দাও। কি দেখতে পাচ্ছ? এবারও আপেলের ভেল্‌কি-বাজীর মতো অভাবনীয় ঘটনা ঘটবে। কাগজটা নীচের দিকে নুইয়ে না পড়ে উপরের দিকে ঠেলা দেবে। তুমি যখন জোরে ফুঁ দিচ্ছ তখন কাগজের উপর ভাগের দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ কাগজের নীচের বাতাসের চেয়ে কম থাকবে। কাগজের নীচের বাতাসের বেশী চাপ তখন সেটিকে উপরের দিকে ঠেলা দেবে। একটা পাখী যখন মাটি থেকে আকাশে উড়তে যায়, তখন তাকে ভালো করে লক্ষ্য কর। বেশির ভাগ পাখীই উড়বার আগে যেন লাফ দিয়ে ডানায় ভর দিয়ে ওড়ে।



একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে উঠবার সময় আমরা হাতলে ভর দিয়ে উঠি। পাখীও তেমনি বাতাসে ভর দিয়ে উড়তে যায়।

কিন্তু বাতাস তো আর হাতলের মত শক্ত নয়, বাতাসে কি করে ভর দেওয়া চলে ?—একটা সাইকেলের পাম্পের মাথার ছিদ্রটা চেপে ধরে পাম্পের হাতলটায় ঠেলা দাও। দেখবে কতো জোরে বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে ভিতর থেকে। বারবার নীচের দিকে পাখার ঝাপ্‌টা



দিয়ে পাখী তাড়াতাড়ি উড়ে যায়। নৌকার দাঁড় যেমন জলটাকে পিছন দিকে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে সামনের দিকে চালায়, পাখীও সেইরকম পাখা দিয়ে পিছন দিকে বাতাসে ধাক্কা দেয়। আর সেজন্য সে সামনের দিকে এগিয়েও যেতে পারে খুব সহজেই।

পাখীর ডানার ওঠানামা লক্ষ্য করেছ? পাখী তার ডানাটাকে একবার নীচের দিকে এবং পরক্ষণেই উপরের দিকে ঠেলা দেয়। নীচের দিকে ঝাপ্‌টা দিলে যদি সে সম্মুখ দিকে এগিয়ে যায়, তা হলে উপর দিকে পরক্ষণে ঝাপ্‌টা দেওয়ার সময় তো তার পিছন দিকে ফিরে আসবার কথা!

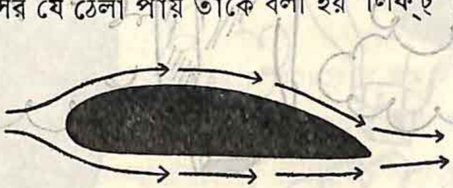
হ্যাঁ, তাই হতো, যদি পাখীর ডানায় পালক না থাকত অতগুলো করে। পালকগুলি এমন ভাবে সাজানো যে, পাখী নীচের দিকে ঝাপ্‌টা দেবার সময় সেগুলি বেশ একসঙ্গে জুড়ে থাকে। কিন্তু পরক্ষণে উপর দিকে ঝাপ্‌টা দেওয়ার সময় তার ডানার পালকগুলি আলগা হয়ে যায় আর তার ভিতর দিয়ে বাতাসটা যায় বেরিয়ে।

আকাশে পাখীর মতো ভেসে বেড়াবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উড়োজাহাজের ধাতুর তৈরী ডানার সঙ্গে এঞ্জিন-চালিত একটা 'প্রপেলার' লাগিয়ে নিলেন।

প্রপেলারের কাজ হচ্ছে এরোপ্লেনটাকে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর ডানার কাজ হচ্ছে প্লেনটাকে মাটি থেকে উপরে তুলে শূন্যে ধরে রাখা। এটা কেমন করে হয় তা তোমরা একটা মজার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারো।

জোরে ছুটছে এমন একটা মোটর গাড়ীর জানালা দিয়ে হাত বাড়াও। যদি তোমার হাতের তালুটা উপর দিকে কিছুটা ঢালুভাবে সামনের দিকে রাখো, তাহলে দেখতে পাবে—হাতের নীচের জোর বাতাসের জন্য তালুটা উপর দিকে ঠেলা খাচ্ছে। তালুটাকে যদি খাড়াভাবে ধর, তাহলে ঐ বাতাসে তালুটা পিছন দিকে ঠেলা খাবে।

ঐ হাতের তালুর মতোই এরোপ্লেনের ডানায় কাজ হয়। ডানাগুলির সামনের দিকে কিছুটা ঢালু করা থাকে। প্লেনের দ্রুত সম্মুখগতি ও প্রপেলারের জন্য যে জোর বাতাস ওঠে সেটা ডানাগুলিকে নীচের দিক থেকে ঠেলা দেয়। ডানাগুলি এই রকম উপর দিকে বাতাসের যে ঠেলা পায় তাকে বলা হয় 'লিফ্‌ট্'।

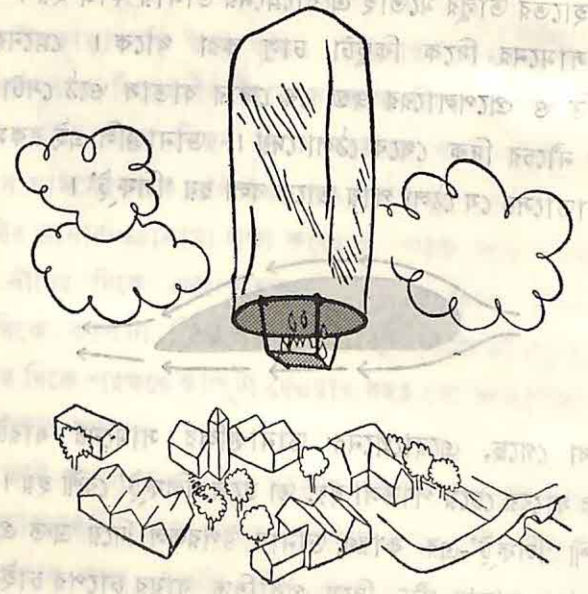


দেখা গেছে, এরোপ্লেনের ডানাগুলির সামনের ধারটা যদি পিছনের ধারের চেয়ে পাতলা হয়, তা হলে 'লিফ্‌ট্' বেশী হয়।

বেশী 'লিফ্‌ট্'-এর কারণ, ডানার উপরতল দিয়ে দ্রুত প্রবাহিত বায়ুর চাপ ডানার নীচ দিয়ে প্রবাহিত বায়ুর চাপের চাইতে কম থাকে। ডানার নীচের বায়ু তখন উপরের দিকে ঠেলা দেয় বেশী জোরে, আর সেজন্যে এরোপ্লেনটার উপরে ওঠাও বেশ সহজ হয়।

হাতে তৈরী বেলুন

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের একুশে নভেম্বর দু'জন ফরাসী ভদ্রলোক পিলাত্রে ডি রোজিয়ার এবং ডিউক ডি আরল্যানডিস একটি বাক্সের মধ্যে ঢুকেছিলেন। বাক্সের মধ্যে ছিল মুখ খোলা একটা স্টোভ। বাক্সটাকে ঝোলান হয়েছিল বেশ বড় লিনেন অস্তর দেওয়া একটা কাগজের ব্যাগের সাথে। আটান্ন ফুট চওড়া এই কাগজের ব্যাগটিকে তৈরী করেছিলেন মণ্টগলফিয়ার কাগজ প্রস্তুতকারকরা। ঐ কাগজের বাক্সে গরম বাতাস পুরে দিতেই সেটা বাক্সসুদ্ধ ঐ দু'জন ফরাসী ভদ্রলোককে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল। খুব সম্ভবত এঁরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আকাশে বিচরণ করেছিলেন।



ব্যাগের বাতাসটা গরম বলে তার চারপাশের বাতাসের চেয়ে হালকা ছিল। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে গরম বাতাস ঠাণ্ডা

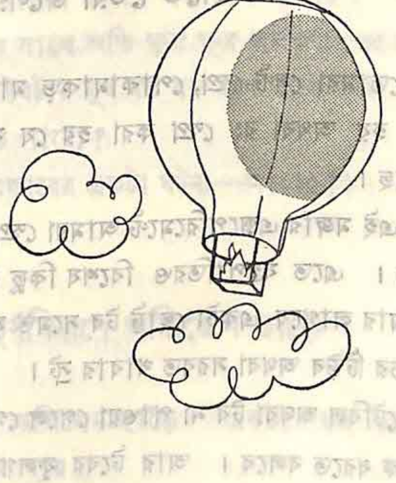
বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা। তাই এই বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ওঁরা খুব সহজেই উপরের দিকে উঠতে পেরেছিলেন।

যে বেলুন তোমরা আকাশে উড়াও তার মধ্যে থাকে হাল্‌কা হাইড্রোজেন গ্যাস। এই গ্যাস বাতাসের চাইতে হাল্‌কা। তাই বেলুনটা আকাশে ওড়ে।

তোমরা কি রোজিয়ার আর আরল্যানডিসের মতো পুরনো দিনের বেলুন বানাতে চাও? তাহলে তোমাদের কতকগুলো জিনিষ জোগাড় করতে হবে।

একটা বড় হাল্‌কা কাগজের তৈরী ব্যাগ নাও। খুব পাতলা তার দিয়ে একটা ছোট বাক্স তৈরী কর। এই বাক্সর মুখের রিংটা যেন কাগজের ব্যাগের সমান সাইজের হয়। এবার কতকগুলি সরু সরু তার অথবা লিউকোপ্লাস্ট (যা দিয়ে ডাক্তাররা ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন —যে কোনও ওষুধের দোকানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে) দিয়ে বাক্সটাকে ব্যাগের নীচে ঝোলাও।





বাক্সটিতে একটা টিনের ঢাক্‌নি বসিয়ে তার মধ্যে তুলো ভর্তি কর। এবার মেথিলেটেড স্পিরিট বা ঐ ধরণের কিছু একটা জ্বালানী ঢেলে তুলোটা ধরিয়ে দাও। খুব সাবধানে আগুন ধরাবে। এই

এক্সপেরিমেণ্টের সময় কাগজে খুব সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে তাই খোলা জায়গায় যাবতীয় কাজকর্ম সারা দরকার।

এই বেলুনের চাইতে যদি আরও সুন্দর একটা বেলুন তৈরী করতে চাও তাহলে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম সাইজের ছটা টিস্যু পেপার কেটে নাও। টিস্যু পেপারের এই ছটা টুকরোয় পর পর আঠা লাগিয়ে একটা বেলুন তৈরি কর। বেলুনের উপরের অংশে একটা গোল টিস্যু পেপার মাপমতো কেটে আঠা দিয়ে আটকাতে হবে। তোমার নিজের হাতে তৈরী এই বেলুনকে দূরের আকাশে সুখে ভেসে বেড়াতে দেখে তুমি একেবারে অবাক হয়ে যাবে। তোমার যদি লাটাই থাকে তবে তার সূতোর সাথে বেলুনটাকে বেঁধে আকাশে ওড়াতে পার। এতে বেলুনটা যেদিকে খুশী যেতে পারবে না। এছাড়া বেলুনটা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও কম থাকবে।

হাতে তৈরী জলের স্প্রে

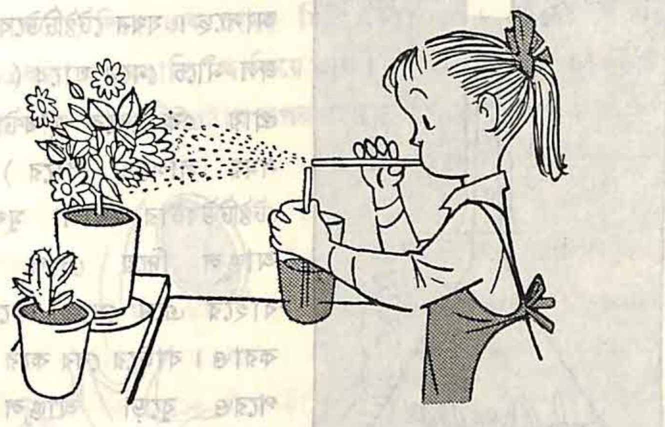
তোমরা সেণ্ট-স্প্রে, পোকামাকড় মারবার জন্য যে স্প্রে ব্যবহার করা হয় অথবা রং স্প্রে করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে তা নিশ্চয়ই দেখেছ।

এই মজার এক্সপেরিমেণ্টে আমরা স্প্রে করব গাছের পাতায় আর ফুলে। এতে যন্ত্রপাতিরও বিশেষ কিছু দরকার হবে না। এর জন্য তোমার লাগবে একটা ছোট্ট টব সমেত ফুলগাছ, টেবিল, গ্লাস, দুটো কাঁচের টিউব অথবা সরবত খাবার স্ট্র।

টেবিল অথবা টব না পাওয়া গেলে গেলাসটাকে তোমার কোনও বন্ধুকে ধরতে বলবে। আর টবের ফুলগাছের বদলে ব্যবহার করবে বাগানের ফুলগাছ। গেলাসটার অর্ধেক জলে ভর্তি করে তার মধ্যে কাঁচের টিউব অথবা স্ট্র লম্বালম্বি ভাবে রাখ। দেখবে ঐ কাঁচের টিউবের মধ্যেকার জল গেলাসের ভিতরের জলের এক লেভেলে

চলে এসেছে।

এবার প্রথম টিউবটার সমকোণে দ্বিতীয় টিউবটাকে মুখোমুখি লাগিয়ে জোরে ফুঁ দাও—ছবিতে ঠিক যেমন ভাবে দেখানো হয়েছে।



ফুঁ দেবার সময় দেখবে, অবাক কাণ্ড, গেলাসের মধ্যে লম্বভাবে রাখা টিউবটার একেবারে মাথার উপরে জল চলে এসেছে। আর কি আশ্চর্য, ফুঁ দেবার সাথে সাথে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা স্প্রে হয়ে ফুলগাছে গিয়ে পড়ছে। টিউবটার মুখ যত সরু হবে ততই ভাল।

কেন এরকম হচ্ছে বলতে পারো?

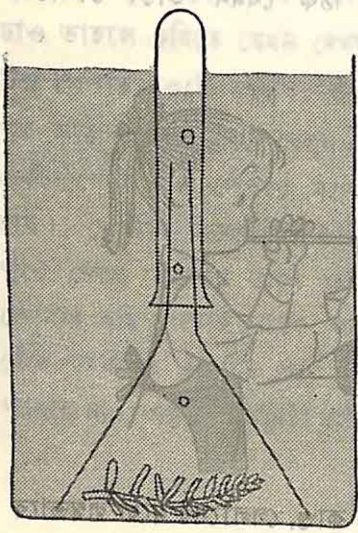
এটাও বারনৌলির আবিষ্কারের একটা ঘটনা—আবার কি!

গাছের পাতা সূর্যকিরণে অক্সিজেন ছাড়ে

সূর্যকিরণে গাছের পাতা অক্সিজেন ছাড়ে। একটা সহজ পরীক্ষা করে এই ঘটনাটা নিজেই বুঝা যায়।

একটা কাঁচের পাত্র অথবা জার নিয়ে সেটা জলে ভর্তি কর। তারপর শ্যাওলা বা ঐ ধরণের অন্য কোনও উদ্ভিদ এনে ঐ কাঁচের পাত্রের নীচে রাখ। এবার একটা ফানেল উপুড় করে তার মাথায়

একটা জলপূর্ণ টেষ্টটিউব বসাও। কাঁচের পাত্রটিকে বেশ কিছুক্ষণ রোদ্দুরে রেখে দিলে দেখবে ফানেলের মধ্যে থেকে অল্প অল্প বুদ্বুদ বেরুচ্ছে আর টেষ্টটিউবের জল আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসছে। যখন টেষ্টটিউবের সমস্ত জল নীচে নেমে যাবে (এর জন্য প্রায় এক থেকে দু'ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে) তখন টেষ্টটিউবটার খোলা মুখ বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ওটাকে বাইরে এনে সোজা করে দাঁড় করাও। বাইরে বের করে আনার পরেও বুড়ো আঙুল দিয়ে টিউবটার মুখ চেপে থাকবে যাতে গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে না পারে।



এবার তোমার বন্ধুকে বল একটা নিভন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ঐ টিউবের মধ্যে ঢুকাতে। দেখবে কেমন দপ্ করে ওটা আবার জ্বলে উঠেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় ঐ গ্যাসটা অক্সিজেন আর সূর্যকিরণে গাছের পাতা অক্সিজেন ছাড়ে। টেষ্টটিউব পাওয়া না গেলে বড় হোমিও-প্যাথিক শিশি দিয়েও কাজ চলবে।

দুম্-পটাস্

আচ্ছা, বলো তো ময়দা কি কখনও জ্বলতে পারে? তুমি এক মুঠো ময়দায় আগুন ধরিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পার—কিন্তু কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু খুব মিহি ময়দা দিয়ে তুমি অনায়াসে এমন একটা বোম্ তৈরী করতে পার যে সবাই তা দেখে অবাক হয়ে যাবে!

একটা বড় টিনের কৌটার নীচে রবার টিউব ঠিকমতো ফিট করে এমন একটা ফুটো কর। এবার রবারের টিউবটাকে কৌটার ফুটোয় ঢুকিয়ে দাও। এবার কৌটার টিউবের মধ্যে একটা ফানেল (না পাওয়া গেলে—কাগজের ঠোঙা তৈরী করে নিতে পার, যার তলায় ফুটো থাকবে) দিয়ে এক চামচ মিহি ময়দা ঢাল। টিনের কৌটার তলায় একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখ। এবার কৌটার ঢাকনিটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি টিউবটার অপর প্রান্তে জোরে ফুঁ দাও।



সঙ্গে সঙ্গে দেখবে অবাক করা এক মজার ব্যাপার! হুম্-পটাস্ শব্দ করে টিনের ঢাকনিটা উড়ে গিয়ে সকলকে একেবারে চমকে দেবে। মিহি ময়দায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তুমি এই কাণ্ডটা করতে পারলে।

ঘরের বাইরে এই এক্সপেরিমেণ্টটা করাই ভাল। এটা করার সময় খেয়াল রাখবে যেন ঢাকনিটা হঠাৎ ছিটকে এসে তোমার চোখে-মুখে না লাগে।

এই এক্সপেরিমেন্টের সময় খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। টিনের ঢাকনিটা কি ভাবে এবং কতখানি শক্ত করে কৌটার সাথে

আটকে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যাবে তা তোমাকে আগে কয়েক-বার এক্সপেরিমেণ্ট করে বার করতে হবে।

বাতাসের কি ওজন আছে ?

বাতাস আমরা কখনও দেখতে পাই না। তবে দেখতে না পেলেও বাতাসকে আমরা অনুভব করতে পারি। বাতাসেরও যে ওজন আছে তা তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? আচ্ছা এস, একটা ছোট্ট মজার এক্সপেরিমেণ্ট করে আমরা বাতাসের ওজন আছে কি নেই তা পরীক্ষা করে দেখি। এর জন্য আমাদের খুব বেশী জিনিষ-পত্তরেরও দরকার নেই। আমাদের চাই—দুটো একই সাইজের বেলুন, একটা ছোট পাট-কাঠি অথবা ঝাঁটার কাঠি, কিছু সুতো।

তোমরা দুটো বেলুনকেই ফুলিয়ে দাঁড়িপাল্লার মতো করে কাঠির দু'পাশে ঝুলিয়ে দাও। এইবার একটা বেলুনের হাওয়া ছেড়ে দিয়ে ঐ দাঁড়িপাল্লাকে তুলে ধর। দেখবে, যে বেলুনটায় হাওয়া রয়েছে দাঁড়িপাল্লাটা সেইদিকে ঝুঁকে পড়েছে। এর থেকে খুব সহজেই প্রমাণিত হয় যে বাতাসেরও ওজন আছে।

কে বেশী ভারী—গরম বাতাস না ঠাণ্ডা বাতাস ?

আগের এক্সপেরিমেণ্টে আমরা জানলাম যে বাতাসের ওজন আছে। এবার আমরা দেখব গরম বাতাস বেশী ভারী না ঠাণ্ডা বাতাস বেশী ভারী।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম একটা কাঠির দু'দিকে দুটো শক্ত কাগজের ঠোঙা ঝুলিয়ে দাও দাঁড়িপাল্লার মতো। ঠোঙা

দুটির নীচের মুখ যেন অল্প খোলা থাকে। ঠোঙার নীচের কাগজটার মাঝখানে গোল করে একটু ফুটো রাখলেই হবে। ঠোঙা দুটোকে সূতো দিয়ে এমনভাবে ঝোলাও যেন কাঠিটা অনুভূমিক (Horizontal) অবস্থায় থাকে। এবার মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটা একটা কাগজের ঠোঙার নীচে সাবধানে রাখ। দেখবে যেন কাগজে আগুন



ধরে না যায়। কিছুক্ষণ পরে মোমবাতিটা সরিয়ে নিলে দেখতে পাবে ঠোঙাটা উপরের দিকে উঠেছে এবং ডান দিকের ঠোঙাটা ভারী হয়ে নীচের দিকে নেমেছে। কেন এমন হ'ল বলো তো ?

বাঁ দিকের ঠোঙার নীচের বাতাস গরম হয়েছে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে বেশী হাল্‌কা। আর ডানদিকের ভারী বাতাসের জন্য ঐ দিকের ঠোঙাটা নীচের দিকে ঝুলে পড়বে !

চুম্বক

চুম্বক লোহাকে টানে। প্রকৃতিতে চুম্বক পাওয়া যায়, সেটাকে বলে প্রাকৃতিক চুম্বক। এছাড়া মানুষ বুদ্ধি করে চুম্বক বানাতেও পারে। এর নাম কৃত্রিম চুম্বক। লোহা ও ষ্টীল দিয়ে অনেক চুম্বক তৈরী করা যায়। অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট, লোহা ইত্যাদি

ধাতুর মিশ্রণের সাহায্যে যে চুম্বক তৈরী হয় সেটা খুবই শক্তিশালী।

চুম্বক দেখতে অনেক রকমের হয়। ইংরাজী ইউ-এর মতো দেখতে চুম্বক, ঘোড়ার খুরের মতো এবং আয়তাকার চুম্বক আমাদের কাজে লাগে প্রায়ই।

চুম্বকের দুটো দিক আছে। উত্তর দিক ও দক্ষিণ দিক। একটা চুম্বকের উত্তর দিক অন্য একটা চুম্বকের দক্ষিণ দিককে আকর্ষণ করে ধরে রাখে। আবার অবাক কাণ্ড, একটার উত্তর দিক অন্যটার উত্তর দিককে বিকর্ষণ করে। দক্ষিণ দিকের বেলায়ও ঠিক এই একই ঘটনা ঘটবে। একখণ্ড চুম্বক শলাকাকে সূতো দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে সেটা সব সময় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকবে।

একটা চুম্বকের সবচেয়ে শক্তিশালী জায়গা হচ্ছে তার দু'প্রান্তের অংশদুটো। চুম্বকের আকর্ষণশক্তি কাঠ প্লাস্টিক এবং জলের মধ্যে দিয়ে সহজেই যেতে পারে।

একটা চুম্বক দিয়ে যদি একটা পেরেককে ক্রমাগত একই দিকে ঘষা যায় তাহলে খানিকবাদে ওই পেরেকটাও চুম্বকে পরিণত হবে। এছাড়া আরও নানাভাবে চুম্বক তৈরী করা যায়।

এক ধরণের চুম্বক আছে—এদের বলা হয় বৈদ্যুতিক চুম্বক। এর মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানো যাবে ততক্ষণ সেটা চুম্বক থাকবে। বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা বন্ধ করে দিলে সেটা আর চুম্বক থাকবে না।

কম্পাসে চুম্বক শলাকাকে এমন ভাবে বসানো থাকে যাতে শলাকাটি স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে। যখন ওটা স্থির হয়ে দাঁড়াবে তখন উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্দেশ করবে। নাবিকরা দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস ব্যবহার করে থাকেন।

চুম্বক খণ্ডগুলি এলোমেলো ভাবে রাখলে তার চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। দুটো চুম্বককে পাশাপাশি রাখবার সময় তাদের উত্তর দিক বিপরীতমুখী করে রাখা প্রয়োজন। মাঝখানে একটা কাঠের টুকরোও রাখা দরকার। এছাড়া চুম্বক রক্ষাকারীও (ইংরাজীতে

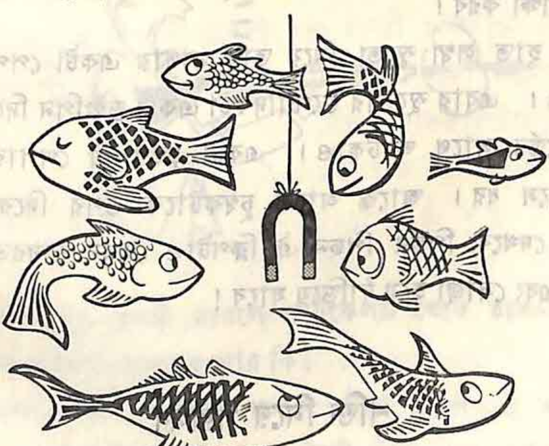
বলা হয় 'কীপার') চুম্বকখণ্ডের উপরে ও নীচে রাখতে হয়।

গরম করলে, হাত থেকে পড়ে গেলে অথবা আঘাত করে চৌম্বকত্ব নষ্ট করা যায়।

চুম্বক শলাকা সব সময় উত্তর-দক্ষিণ দিক মুখ করে থাকে তার কারণ পৃথিবীর একটি বিরাট চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে। পৃথিবীর চুম্বকত্বের জন্যেই সে একখণ্ড চুম্বককে সব সময় উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ করে রাখে। পৃথিবী কেমন করে তার এই চৌম্বকক্ষেত্র এবং চুম্বকশক্তি পেয়েছে এর সঠিক কারণ বিজ্ঞানীদের এখনও অজানা। বড় হয়ে তোমরা এ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবে।

চুম্বক দিয়ে মাছ ধরা

তুমি হয়তো ভাবছ—তাজ্জব ব্যাপার, চুম্বক দিয়ে আবার কেউ মাছ ধরতে পারে নাকি? হ্যাঁ, পারে—অবশ্য যদি সেটা লোহার মাছ হয়। আশা করি এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ।



কার্ডবোর্ড অথবা পাতলা কাঠ কেটে মাছ তৈরী কর। কার্ড-বোর্ডের তৈরী মাছের একপাশে কতকগুলো পেপারক্লিক এমন ভাবে

আটকে দাও যেন মাছটা ডুবে না যায় অথবা জলের উপর ভেসে না থাকে। তোমাকে দেখতে হবে যে ঠিক কতগুলো ক্লিপ লাগালে জলের মাঝামাঝি ভাসতে পারে। কাঠের তৈরী মাছের মাঝখানে ছোট্ট এক টুকরো টিনের ফালি আটকাতে পারো।

এবার ছিপের মতো দেখতে একটা কাঠির মাথায় সুতো দিয়ে বেঁধে একটা চুম্বক ঝুলিয়ে দাও। ব্যস, এবার তোমার ছিপ রেডি হয়ে গেল, চল মাছ ধরতে যাই।

চুম্বকের শক্তি কত ?

চুম্বকের যে কি অসম্ভব শক্তি আছে তা বলে শেষ করা যায় না। বৈদ্যুতিক চুম্বক কেমন করে অনায়াসে বিরাট বড় বড় পেরেকের ড্রাম এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তুলে নিয়ে যায় যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এখানে আমরা খুব ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করে চুম্বকের শক্তি পরীক্ষা করব।

এক হাত লম্বা সুতো নিয়ে তার মাথায় একটা পেপার ক্লিপ আটকাও। এবার সুতোর উল্টোদিকটা একটা ড্রইংপিন দিয়ে একটা কার্ডবোর্ডের সাথে আটকাও। একটা চুম্বক ঐ পেপার ক্লিপের কাছে এনে ধর। আস্তে আস্তে চুম্বকটাকে উপর দিকে তুলতে থাক। দেখবে, পিছন পিছন ঐ ক্লিপটাও কেমন সুন্দরভাবে উঠে আসবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে!

শক্তি নিয়ে পরীক্ষা

স্যার আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৫) হলেন সর্বযুগের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। জন্মসূত্রে ইংরেজ এই বিজ্ঞানীর ঘাড়টা এত

নড়বড়ে ছিল যে—তিনি তাঁর মাথাটা খাড়া করে রাখতে পারতেন না। ঘাড়ের সাথে মাথাটাকে ঠেকান দেওয়ার জন্য তাঁকে একটা বেল্ট ব্যবহার করতে হতো। এটা না করলে ওঁর মাথাটা সামনের দিকে নুয়ে পড়ত। কিন্তু যে নড়বড়ে মাথাওয়ালা বিজ্ঞানীর কথা উঠলে সারা দুনিয়ার লোকের মাথা শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে তিনি স্যার নিউটন ছাড়া আর কে হতে পারেন? তাঁর এই নড়বড়ে মাথা থেকেই বেরিয়েছে তাবৎ বিশ্বের যতো সব সেরা আবিষ্কার। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, অংকশাস্ত্র, জ্যোতিবিজ্ঞানের বড় বড় সূত্র নিউটনের আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে।



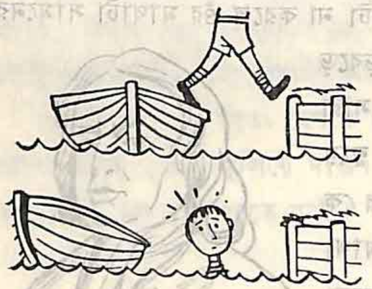
নিউটন গতির গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক সূত্র বের করেন। এর তৃতীয় সূত্রটি হচ্ছে—'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমপরিমাণ বিপরীতমুখী ক্রিয়া



আছে।' অর্থাৎ ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে—অনেকটা সেই রকম ব্যাপার-স্যাপার আর কি!

আঙুল দিয়ে একটা পাথরকে ঠেলা দিলে ঐ পাথরটাও সমপরিমাণ শক্তি দিয়ে আঙুলকে উল্টে ঠেলা মারে (যদিও আমরা সেটা দেখতে পাই না)। বন্দুক থেকে গুলি সামনে বেরোবার সময় বন্দুকটা পেছনের দিকে ধাক্কা মারে—এটা হয়তো তোমরা লক্ষ্য করে

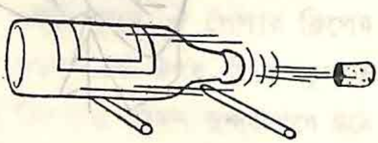
থাকবে। নিউটনের গতিসূত্রের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে এটারও ব্যাখ্যা করা যায়।



ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে এই তৃতীয় সূত্র বুঝাবার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, তুমি কি কখনও নৌকা থেকে লাফ দিয়ে ডাঙায় নামবার চেষ্টা করেছ? তুমি যখন লাফ মারতে যাবে ডাঙায় ঠিক সে সময় এক পা দিয়ে নৌকাকে পিছনের দিকে ঠেলে দাও, তাই না? তা না হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে বলো তো? আমাকে আর বলতে হবে না, ছবি দেখেই নিশ্চয় তোমরা তা বুঝতে পারছ!

হাতে তৈরী কামান

একটা বোতলের ভিতর বেশ কিছুটা ভিনেগার ঢাল, যেন ওটা শুইয়ে রাখলে ভিনেগার বাইরে বেরিয়ে না আসে। এবার এক চামচ বেকিং পাউডার একটা কাগজে নিয়ে তার চারপাশ ভাল করে মুড়ে ঐ বোমের পুরিয়াকে বোতলের মধ্যে



সাবধানে ফেলে দাও। এরপর খুব তাড়াতাড়ি বোতলের মুখের ছিপিটা এঁটে দাও আর বোতলের তলায় ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম দু'টো পেন্সিল রাখ। একটু বাদে এমন জোরসে দুম-পটাস্ শব্দ হবে যে সবাই একেবারে চমকে উঠবে!

কেন এমন হ'ল বলো তো? আসলে ভিনেগার হচ্ছে এক ধরণের এ্যাসিড এবং বেকিং পাউডার হ'ল সোডা অর্থাৎ ক্ষার জাতীয়

জিনিষ। এই এ্যাসিড এবং ক্ষারের বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরুতে থাকে। আর সেজন্যেই বোতলের মধ্যে জমা কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর চাপে ছিপিটা ছুম্-পটাশ শব্দ করে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তুমি নিজের হাতে এই ছোট্ট কামান তৈরী করে সকলকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো।

জেট প্লেন কি করে এগিয়ে যায়?

একটা বেলুন ফুলিয়ে তার মুখটা আঙুল দিয়ে শক্ত করে চেপে ধর। এখন বেলুনের মধ্যেকার বাতাসের চাপ তার বাইরের বাতাসের চাইতে বেশী। তাই বেলুনের ভেতরকার বাতাস রবারকে সমপরিমাণ চাপ দিয়ে সব দিকে ঠেলা দেয়। আর সেইজন্যেই বেলুনটাকে বেশ বড়সড় একটা বলের মতো দেখতে লাগে।



এখন হঠাৎ যদি বেলুনের বাতাসটা ছেড়ে দেওয়া যায়—তাহলে কি হবে বলো তো? যেদিকে বাতাসটা বেরিয়ে যাবে বেলুনটার গতি তার ঠিক উল্টো দিকে হবে। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের নিয়ম এখানে ঠিকই খাটছে, কি বলো? বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় পেছন দিকে একটা ঠেলা মেরে যায়। আর তার ফলে বেলুনটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তুমি একটা বেলুন নিয়ে নিজের হাতে পরীক্ষা করে এর সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারো।

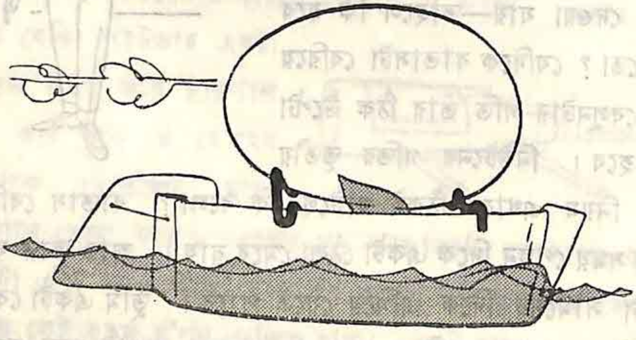
তুমি হয়তো ভাবছ—বেলুনের বাতাস বেরিয়ে গেলে সেটা উল্টো-মুখো ধায়, এর সাথে জেট প্লেনের সম্পর্কটা কোথায়? জেট প্লেন

তো আর বেলুন নয়!

তা অবশ্য নয়, কিন্তু জেট প্লেনের জ্বালানী ঘর থেকে গরম গ্যাস পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ঠিক বেলুনের মতো সামনের দিকে জোরে ঠেলা মারে। তার ফলেই জেট প্লেন এগিয়ে যেতে পারে। রকেটও এই একই নিয়মে কাজ করে। তবে রকেট মহাকাশে—যেখানে একেবারেই বাতাস নেই, সেখানে খুব ভাল ভাবে কাজ করে। কেন বলতে পার? কোথাও বাতাস থাকলে রকেটকে সেই বাতাস কেটে এগুতে হয়। মহাকাশে বাতাস না থাকায় রকেট খুব সহজেই এগিয়ে যেতে পারে।

জেট নৌকা, ছুট্‌ল সাবাস!

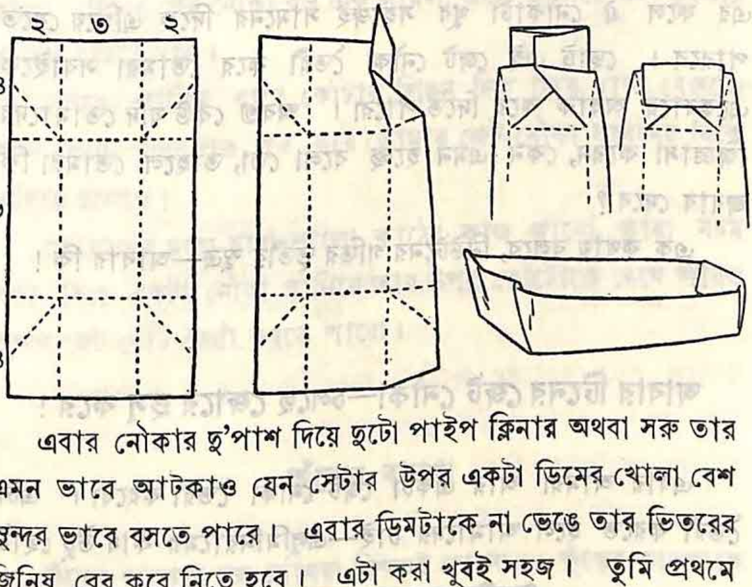
এই সাবাস জেট নৌকা তৈরী করতে হলে আমাদের চাই—কিছু পুরু কাগজ, আঠা, একটা আস্ত ডিম, একটা বড় শোলার ছিপি, কিছু তুলো, মেথিলেটেড স্পিরিট, একটা ছোট টিনের ঢাকনি, এক গামলা জল।



এই জিনিষগুলো জোগাড় হয়ে গেলে খুব সহজেই আমরা এই মজার 'জেট নৌকা' তৈরী করতে পারব। যদিও এটাকে আমরা 'জেট নৌকা' বলছি—আসলে কিন্তু এটা ষ্টীম নৌকা। কিন্তু জেট

প্লেন যে নিয়মে এগিয়ে যায়—ঠিক সেই নিয়মেই আমরা এটাকে তৈরী করছি বলে এটার নাম দেওয়া হয়েছে 'জেট নৌকা'।

ছবিতে যেমন দেখনো হয়েছে সেই ভাবে একটা পুরু কাগজের নৌকা তৈরী কর। তুমি যদি অন্য কোনও ভাবে কাগজের নৌকা তৈরী করতে পার তাহলেও চলবে। একটা ছোট কাগজের টুকরো কেটে নৌকার হাল বানাও। হালে একটা ফুটো কর। এইবার নৌকার পিছনে দুটো ফুটো করে হালটাকে তার সাথে সূতো দিয়ে বাঁধ।



এবার নৌকার দু'পাশ দিয়ে দুটো পাইপ ক্লিনার অথবা সরু তার এমন ভাবে আটকাও যেন সেটার উপর একটা ডিমের খোলা বেশ সুন্দর ভাবে বসতে পারে। এবার ডিমটাকে না ভেঙে তার ভিতরের জিনিষ বের করে নিতে হবে। এটা করা খুবই সহজ। তুমি প্রথমে ডিমের দু'প্রান্তে দুটো ফুটো কর। এবার একটা ফুটো দিয়ে জোরে ফুঁ দাও। দেখবে, ডিমের অন্য ফুটো দিয়ে তার ভিতরকার জিনিষ বাইরে বেরিয়ে আসবে।

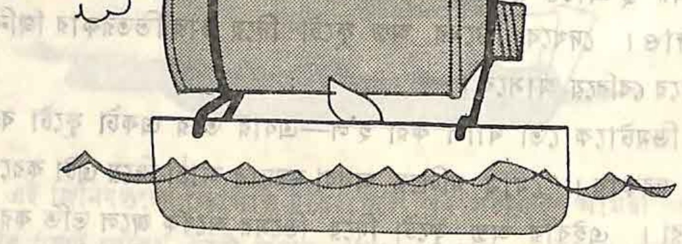
ডিমটাকে তো খালি করা হ'ল—এবার তার একটা ফুটো বন্ধ করা দরকার। মোম গলিয়ে অথবা ময়দার আঠা দিয়ে এটা করতে পারো। এইবার অন্য ফুটো দিয়ে ডিমের অর্ধেক জলে ভর্তি কর। তারপর তারের উপর এমনভাবে আস্তে ওটাকে শুইয়ে দাও যেন

তার ফুটোর দিকটা নৌকার পিছন দিকে অর্থাৎ যেদিকে হাল রয়েছে সেইদিকে থাকে। এখন তোমার নৌকার 'বয়লার' তৈরী শেষ হ'ল। এবার দরকার—ফারনেস অর্থাৎ তাপ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। এর জন্য তুমি একটা ছোট্ট টিনের ঢাকনিতে কিছুটা তুলো নিয়ে তার মধ্যে মেথিলেটেড স্পিরিট ঢাল। এখন এই ছোট্ট মজার জেট নৌকাকে এক গামলা জলে ভাসিয়ে ঐ ফারনেসে অর্থাৎ তুলোয় সাবধানে আগুন ধরিয়ে দাও। একটু বাদেই দেখতে পাবে ডিমের মধ্যেকার জল ফুটছে আর তার পিছনের ফুটো দিয়ে বাষ্প বেরুচ্ছে। এর ফলে ঐ নৌকাটা খুব সহজেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। ছোট্ট এই জেট নৌকা তৈরী করে তোমরা সবাইকে একেবারে অবাক করে দিতে পারো। অবশ্য কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন হচ্ছে বলো তো, তাহলে তোমরা কি জবাব দেবে?

এক কথায় বলবে, নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র—আবার কি!

আবার টিনের জেট নৌকা—চলছে জোরে হুস্ করে!

এবার আমরা আর একটা জেট নৌকা তৈরী করবো। এটা তৈরী করতে হলে আমাদের চাই—এলুমিনিয়ামের কাঁধ উঁচু ছোট



একটা ডিস, খালি পাউডারের টিন, কিছু তার, একটা টিনের ছোট্ট

ঢাক্‌নি, কিছু তুলো ও মেথিলেটেড স্পিরিট।

পাউডারের টিনের মুখটা বন্ধ রাখতে হবে আর কৌটার পিছনে একটা ফুটো করা দরকার। এইবার টিনের কৌটার অর্ধেক জলে ভর্তি করে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে এলুমিনিয়ামের ডিসের সাথে সাবধানে পুরু তার দিয়ে ওটাকে আটকাও। এর জন্য ডিসের সামনে এবং পিছনে দুটো করে পেরেক দিয়ে ফুটো করার প্রয়োজন হবে।

এইবার ছোট্ট টিনের কৌটায় স্পিরিট ভেজানো তুলো রেখে দাও। টিনের জেট নৌকা বড় এক গামলা জলে ভাসিয়ে ওই তুলোয় আগুন ধরিয়ে দাও।

দেখবে, খানিক বাদে কৌটার পিছন দিক দিয়ে বাষ্প বেরুচ্ছে আর কেমন সুন্দর পত্‌ পত্‌ করে তোমার জেট-নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে!

তোমাদের মধ্যে যারা ভালো কাঠের কাজ জানো, তারা নরম কাঠ দিয়ে একটা নৌকা বানিয়ে তার উপর কৌটোকে রেখে আরও সুন্দর জেট-বোট তৈরী করতে পারো।

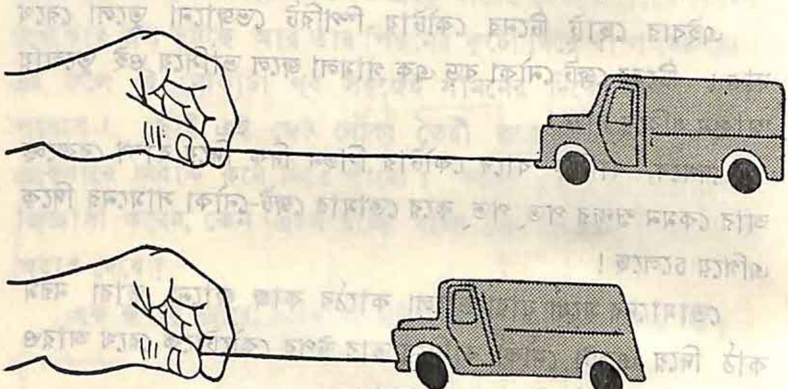
কুঁড়ের বাদশা

কুঁড়ের বাদশার গল্প তোমরা নিশ্চয়ই জানো। কুঁড়ের বাদশাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে হলে কি মুস্কিলই না হতো! আমাদের এই এক্সপেরিমেণ্টটাও অনেকটা কুঁড়ের বাদশার মতন। একবার একটু ঠেলা দিলেই আপনা থেকে ওটা চলতে থাকবে। এসো, কুঁড়ের বাদশার এই মজার এক্সপেরিমেণ্টটা এবার আমরা করে দেখি।

এটা করতে হলে আমাদের চাই—ছোট্ট একটা খেলনা গাড়ী আর একটা ইলাসটিক রবার ব্যাণ্ড। ইলাসটিক রবার ব্যাণ্ড হাতের কাছে না পেলে রবার গার্ডার (চা, চিনি, বিস্কুট ইত্যাদি কাগজে

করে দেবার সময় দোকানী যে জিনিষ দিয়ে ওটা বাঁধে) হলেও চলবে।

যদি আমি তোমায় বলি কোনও গাড়ীকে প্রথমে চালাতে বেশী শক্তির দরকার এবং সেটা একবার চলতে শুরু করলে আর ততটা শক্তির দরকার হয় না—তাহলে তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আচ্ছা, এবার তোমার খেলনা গাড়ীতে রবার ফালিটা আটকে টান দাও। গাড়ীটা যখন সবেমাত্র চলতে শুরু



করেছে তখন রবারের ফালিটা কতখানি বেড়েছে তা ভালো করে লক্ষ্য কর। এবার গাড়ীটা বেশ খানিকটা পথ চলবার পর আবার রবারের ফালিটার দিকে তাকাও। এবার দেখবে, অবাক কাণ্ড—রবারের ফালিটা আগের মতো অতটা বাড়েনি অর্থাৎ ওটা একবার চলতে শুরু করলে তারপর কম শক্তি প্রয়োগ করেই ওটাকে চালান যায়।

প্রথমবার গাড়ীটা ছিল অনেকটা কুঁড়ের বাদশার মতন। ঠেলা খেয়ে তবে বাদশা চলতে শুরু করেছিল।

শুধু খেলনা গাড়ীই নয়—পৃথিবীর যে কোনও বস্তুই হচ্ছে এই রকম কুঁড়ের বাদশা। কোনও জায়গায় বসে থাকলে এদের নড়ানো খুবই মুস্কিল। অবশ্য একবার জোরে ঠেলে দিলে তারপর বেশ কিছুটা পথ এরা নিজেদের ইচ্ছেতেই চলে। নিউটন এই ঘটনাকে

বলতেন—'নড়তে গররাজী বাবাজী' বা জাড্যতা।

তুমি যখন সাইকেলটাকে প্রথম চালাও তখন কতো জোরে প্যাডেলে পা দিয়ে ঠেলা মারতে হয়। কিন্তু ব্যস—ওই পর্যন্ত, খানিকক্ষণ চলার পর আর তোমার প্যাডেল করবার দরকার হয় না। আপনা থেকেই সাইকেলটা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে।

আবার এই কুঁড়ের বাদশারা যেমন সহসা নড়তে চড়তে চায় না তেমনি একবার নড়লে এদের থামানোও মুস্কিল। তুমি হঠাৎ সাইকেলে ব্রেক কষে দেখো। সামনের দিকে বেশ জোরে একটা ঝাঁকুনি লাগবে। কেন বলো তো? আসলে সাইকেলটা প্রথমে নড়তে যেমন গররাজী ছিল—থামতেও ঠিক ততখানি গররাজী। সাইকেলটার তখন চলতে থাকারই ইচ্ছে হবে খুব। একেই বলা হয়েছে—ইনার্সিয়া বা জাড্যতা।

কোনও বস্তুর স্থির অবস্থা থেকে তাকে চলন্ত অবস্থায় নিতে অথবা চলন্ত অবস্থা থেকে স্থির অবস্থায় আনবার জন্যে বেশী শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বস্তুটা যখন চলছে তখন কিন্তু অতটা শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না।

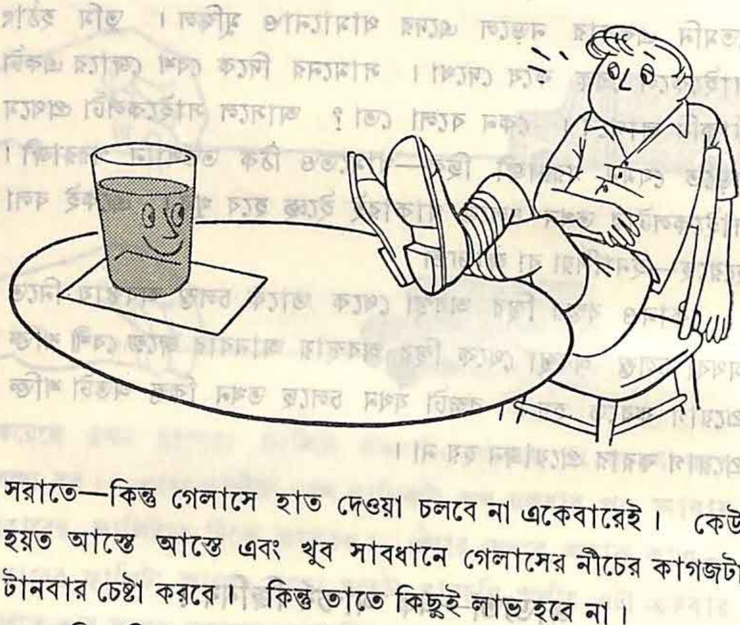
জাড্যতা—এক আশ্চর্য জিনিষ!

'সত্যি কথা বলতে কি, এই ইনার্সিয়া বা জাড্যতা বাস্তবিকই ভারী মজার ব্যাপার'—চেয়ারে আরাম করে বসে টেবিলের উপর পা তুলে বলল অতুল। 'নিউটনের এই ইনার্সিয়ার থিয়োরী আমার পরীক্ষা করে বুঝবার আদৌ দরকার নেই, আমি কোনও পরীক্ষা না করেই এটা ভালভাবে বুঝতে পারছি।' (তোমাদের চুপি চুপি বলছি, কাউকে বোল না যেন—আসলে অতুল হচ্ছে ভীষণ কুঁড়ে, মানে কুঁড়ের বাদশা আর কি! আর সেই জন্যেই তার ইনার্সিয়ার

ব্যাপারটা এক্সপেরিমেণ্ট করে বুঝবার দরকার নেই !)

আচ্ছা, এই আলসে অতুলকে এইবার চমকে দেওয়া যাক্ ছোট একটা মজার এক্সপেরিমেণ্ট দেখিয়ে।

টেবিলের উপর এক গেলাস জল রয়েছে—যার বাইরের দিকটা একেবারে শুক্‌নো খট্‌খটে আর তার নীচে রয়েছে একটা পুরু কাগজ। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর কাগজের উপর থেকে গেলাসটিকে



সরাতে—কিন্তু গেলাসে হাত দেওয়া চলবে না একেবারেই। কেউ হয়ত আস্তে আস্তে এবং খুব সাবধানে গেলাসের নীচের কাগজটা টানবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হবে না।

তুমি যদি এবার কাগজটার একদিকে হাত দিয়ে হঠাৎ জোর হ্যাঁচ্‌কা টান মার, তাহলে দেখবে, অবাক কাণ্ড, গেলাসটা একটু নড়ে উঠেছে বটে কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাগজটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। গেলাসের জল যেমন ছিল ঠিক তেমনিই থাকবে।

গেলাসটা যেখানে যেমন ভাবে ছিল ঠিক সেখানেই থাকবে—কেন বলো তো ? কেন আবার, ইনার্সিয়া বা জাড্যতার জন্যেই ! এই এক্সপেরিমেণ্টটা প্রথম দেখানোর সময় প্লাসটিকের গেলাস নিয়ে দেখাবে, তাহলে গেলাস ভেঙে যাবার ভয় থাকবে না।

কোন সূতোটা ছিঁড়তে চাও ?

ইনার্সিয়ার আরও একটা মজার এক্সপেরিমেন্টের কথা এবার বলব। এটা দেখাতে হলে তোমার চাই—একটা মোটা বই আর কিছু শক্ত সূতো।



প্রথমে সূতোটাকে দু'ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর একভাগ দিয়ে বইটাকে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। সূতোর অন্য ভাগটা এবার বইয়ের নীচের দিকে বাঁধো। খুব আস্তে আস্তে নীচের সূতোয় টান দিয়ে তুমি উপরের দড়িটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পার। কিন্তু যদি তুমি নীচের সূতোটাকে ছিঁড়তে চাও—তাহলে তোমাকে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান মারতে হবে। মোটা বইটার ইনার্সিয়া বা জাড্যতার জন্যে তোমার এই হ্যাঁচ্‌কা টান উপরের দড়ি পর্যন্ত পৌঁছবে না। ভারী মজার ব্যাপার এটা—তাই না ?

লাঠিটা পড়বে কোন্‌দিকে ?

এই এক্সপেরিমেন্টের শিরোনামা দেখে তোমরা হয়তো ভাবছ এটা একটা মামুলী খেলা, এর মধ্যে আর এমন কি মজার ভেল্‌কি-

বাজী লুকিয়ে আছে! আসলে কিন্তু এটা এই বইয়ের অন্যতম আশ্চর্য এক্সপেরিমেণ্ট।

তোমার দু'হাতের তর্জনী লম্বা করে ছড়িয়ে এমনভাবে একটা লাঠি তার উপর রাখ যেন লাঠিটার একদিক অন্যদিকের চাইতে বেশী বেরিয়ে থাকে (ছবি দেখ)। এখন প্রশ্ন হ'ল যদি তুমি তোমার হাত দুটোকে কাছাকাছি নিয়ে আস তাহলে লাঠিটা পড়বে কোনদিকে? স্বভাবতই তোমাদের মনে হতে পারে যে দিকে লাঠিটা বেশী বেরিয়ে থাকবে, সেইদিকেই ওটা ঝুঁকে পড়বে। আচ্ছা, এবার হাত দুটোকে কাছাকাছি নিয়ে এস। কি দেখতে পাচ্ছ? যা ভেবেছিলে তার ঠিক উল্টো হ'ল তাই নয় কি? লাঠিটা তো পড়লই না উপরন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! যেখানে তোমার আঙুল দুটো জোড়া লাগবে—লক্ষ্য কর লাঠিটা ঠিক তার কেন্দ্রস্থলে



নিজের ভারসাম্য রেখেছে। তুমি যে রকম লাঠিই ব্যবহার করো না কেন, সব ক্ষেত্রে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

এই ঘটনাটা ঘটছে ঘর্ষণের জন্য। লাঠির যে দিকটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে সেদিকটা আঙুলের উপর বেশী বলপ্রয়োগ করছে অন্যদিকের চাইতে। বেশী বলপ্রয়োগ করলে ঘর্ষণের মাত্রাও বেশী হবে, তাই লাঠিটা ওই জায়গা থেকে এখন উলটে পড়বে না। আবার মজা দেখ, লাঠির বেরিয়ে থাকা ছোট দিকটা অপর আঙুলে বলপ্রয়োগও করছে কম। সেইজন্যে এখানে ঘর্ষণের মাত্রাও অনেক

কম হবে। যখন দুটো আঙুলেই বলপ্রয়োগের মাত্রা সমান হবে (এ ক্ষেত্রে আঙুল দুটো লাঠির মাঝখানে থাকবে এবং লাঠির দু'পাশের দিকই সমান হবে) তখনও কিন্তু লাঠিটা আঙুলের উপর সুন্দর ভাবে শুয়ে থাকবে—কখনও পড়ে যাবে না।

মোমবাতির ঢেঁকি

মোমবাতির ঢেঁকির কথা শুনে তোমাদের কাঁঠালের আমসত্ব বা সোনার পাথর বাটির কথা মনে হচ্ছে—তাই না? তা তোমাদের যাই মনে হোক না কেন আসলে কিন্তু মোমবাতির ঢেঁকি সত্যি সত্যি তৈরী করা যায়। আর এই মজাদার এক্সপেরিমেণ্ট করে তোমরা বন্ধুদের সবাইকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারো।



মোমবাতির ঢেঁকিটা আপনা থেকেই উঠা-নামা করবে। এর জন্যে তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তোমার তৈরী মোমবাতির ঢেঁকির কাণ্ডকারখানা দেখে ছেলে-বুড়ো সকলেই খুব অবাক হয়ে যাবে। এটা করতে হলে আমাদের চাই—একটা বড় মোমবাতি, একটা বড় সূঁচ, দুটো কাঁচের গেলাস ও দুটো প্লেট।

প্রথমে মোমবাতির উল্টোদিকের পলতেটা বের করে নাও। এবার মোমবাতির ঠিক মাঝখান দিয়ে সূঁচটা ঢুকিয়ে দাও। সূঁচের দু'পাশে বেড়িয়ে থাকা অংশকে দুটো গ্লাসের উপর রাখ। এবার তোমার মোমবাতির ঢেঁকি তৈরী করা শেষ হ'ল। কি করে এবার তুমি মোমবাতিটাকে ওঠা-নামা করাবে বলো তো? এর জন্য মোমবাতির দুটো পলতেয় আগুন ধরিয়ে দাও। দেখবে মোমবাতির একদিক থেকে এককোঁটা মোম গলে পড়ল। ঐ দিকটা হাল্‌কা হয়ে যাওয়ায় উপরের দিকে উঠবে। কিছুক্ষণ বাদে অপর দিক থেকে আর এককোঁটা মোম গলে পড়বে এবং সেইদিকটা উপরের দিকে উঠবে। মোমবাতিটার ব্যালান্স না থাকায় সেটা এইরকম অনবরত উপর-নীচ করতে থাকবে।

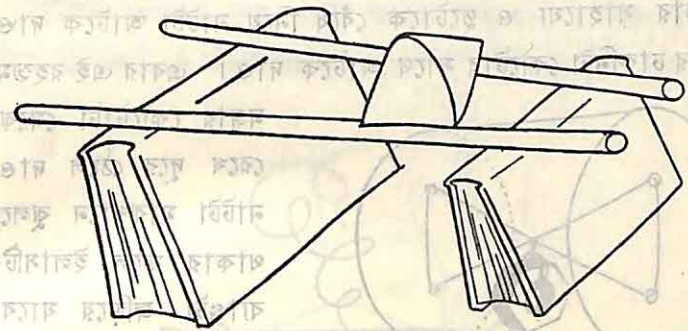
ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম টিনের অথবা পিচ-বোর্ডের দুটো ছোট খেলনা তৈরী করে মোমবাতির দু'পাশে বসিয়ে দিলে ওটা খুবই মজার হবে দেখতে।

মজার ভেল্‌কি

কোনও জিনিষ ঢালু পথের উপর রাখলে সেটা সব সময় উপর দিক থেকে নীচের দিকে নামে—এটাই আমরা সচরাচর দেখে থাকি। কিন্তু আমাদের এই মজার খেলনা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে (সত্যি কিনা মাথা ঘামিয়ে বলো) ঢালু পথের নীচের দিক থেকে আপনা-আপনি ম্যাজিকের মতো উপরের দিকে উঠবে!

পুরু কাগজ অথবা খুব পাতলা কার্ডবোর্ড কেটে নিয়ে দুটো কোণ তৈরী কর। এইবার আঠা দিয়ে ওদের দুটো মুখ জুড়ে দাও ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। এবার একটা বড় বই এবং একটা ছোট বই টেবিলের উপর রাখ। বইয়ের পিছন দিকটা যেন উপর দিকে থাকে। বইগুলির ওপরে দুটো কাঠি এমন ভাবে রাখতে হবে যেন তাদের

উপরের দিকের অংশ বেশ দূরে সরে থাকে নীচের অংশ দু'টি থেকে (ছবি দেখ)।



এইবার তোমার তৈরী কোণটিকে কাঠির উপর ছোট বইটির কাছে রাখ। তুমি অবাক হয়ে দেখবে ওটি ঢালু জায়গা থেকে কেমন ম্যাজিকের মতো উপরের দিকে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে! সত্যি সত্যি কি আর ওটা উঁচুতে উঠছে? আসলে ওটা নীচের দিকেই নামছে—কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যেন উপরের দিকে উঠছে।

কোণটা যখন চলতে শুরু করেছে তখন সেটাকে ভাল করে লক্ষ্য কর। উপরের দিকে ওঠার সময় রাস্তাটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। সাথে সাথে কোণটার ভরকেন্দ্রও নীচের দিকে নামতে থাকবে। কাগজের 'কোণ' তৈরী করতে না পারলে প্লাসটিকের দুটো হালকা ফানেল বাজার থেকে কিনে তাদের মুখ 'রবার সলুসান' অথবা 'কুইক ফিক্স' দিয়ে জুড়েও এই মজার এক্সপেরিমেণ্টটা দেখানো যায়।

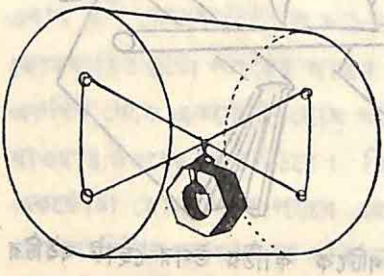
রহস্যময় বাক্স

রহস্যময় এই অদ্ভুত বাক্সটা তৈরী করতে হলে আমাদের চাই—

পৌনে একগজ ইলাসটিক রবার ব্যাণ্ড, কিছু সূতো, একটা ছোট নাট অথবা লোহার কোন ছোট্ট জিনিষ, গোল একটা টিনের কৌটো।

টিনের কৌটোর ঢাকনায় দুটো ও নীচে দুটো ফুটো কর। ছবিতে

যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ইলাসটিক রবার ব্যাণ্ডটা কৌটোয় আটকাও। যেখানে রবারের ব্যাণ্ড দুটো মিশেছে সেইখানে একটা সূতোর সাহায্যে ও দুটোকে বেঁধে নিয়ে নাটটা আটকে দাও। এবার ঢাকনিটা কৌটোর সাথে আটকে দাও। এবার এই রহস্যময়



মজার কৌটোটা মেঝেয় রেখে দূরে ঠেলে দাও। নাটটা মাঝখানে ঝুলতে থাকার ফলে ইলাসটিক ব্যাণ্ডটা জড়িয়ে যাবে। টিনের কৌটোটাকে খুব বেশী ঠেলা দিও না তাহলে নাটটাও ঘুরতে থাকবে। এখন একটু ঠেলা দিলেই দেখবে কেমন সুন্দর ভাবে আপনা থেকেই এগিয়ে চলেছে আপনমনে। কৌটোটা এগিয়ে যাবার শক্তি পাচ্ছে জড়িয়ে যাওয়া রবারের ব্যাণ্ড থেকে। যে কৌটোর ভিতর লুকিয়ে রাখা এই মজার ব্যাপার জানে না সে ওটাকে এগিয়ে যেতে দেখে খুবই অবাক্ হয়ে যাবে—সন্দেহ নেই।

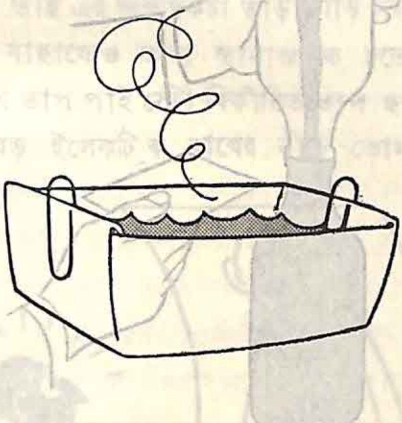
কাগজের বেসিনে জল ফুটানো

তুমি কি বিশ্বাস করতে পার যে একটা কাগজের বেসিনে জল নিয়ে তা আগুনে ফুটানো যায়?—কি, অবাক লাগছে? তুমি বুঝি ভাবছ জল গরম করবার সময় বেসিনের কাগজে আগুন ধরে যাবে?

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ঠিক সেই রকম একটা কাগজের বেসিন টুক্‌রো শক্ত কাগজ দিয়ে তৈরী করো। বেসিনের দুই কোণা ক্লিপ দিয়ে আটকে দাও। তারপর বেসিনে জল ঢেলে ওটা আগুনের শিখায় ধর। (গ্যাসের আগুন না পেলে মোমবাতির শিখাতেই কাজ চলবে।) লক্ষ্য রাখতে হবে আগুনের শিখা যেন কোনক্রমেই

বেসিনের জলের লেভেলের উপর না যায়। এ ছাড়া বেসিনের কোণাতেও যেন আগুন না লাগে।

খানিক বাদেই দেখবে—জল ফুটতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তোমার কাগজের বেসিনের কিছুই হয়নি। বেসিনকে গরম করবার সময় তার

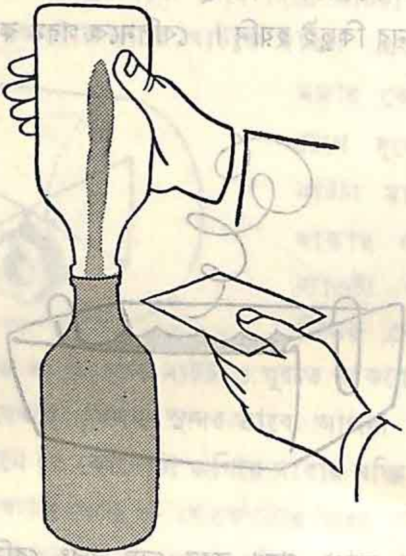


ভেতরকার জল তাপ গ্রহণ করে নেয় এবং বেসিনের কাগজের তাপমাত্রা কখনই ২১২° ফারেনহাইটের বেশী হবে না। এই তাপ কাগজে আগুন ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়—আর তার ফলেই এই মজার এক্সপেরিমেণ্টটা করা সম্ভব হচ্ছে।

গরম জল বেশী ভারী না ঠাণ্ডা জল ?

একটা বোতলের মধ্যে অল্প কিছু লাল অথবা নীল কালি ঢাল। এবার তার মধ্যে গরম জল ঢেলে ঐ বোতলটা কানায় কানায় ভর্তি কর। এখন দ্বিতীয় বোতলে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তার মুখে মোম মাখান একটা কাগজ অথবা একটা পোষ্টকার্ড রাখো। বোতলের মুখটা শক্ত করে ধরে সাবধানে উল্টে নিয়ে পোষ্টকার্ডসুদ্ধ ওটা গরম বোতলের উপর রাখ। এবার আস্তে আস্তে ঐ পোষ্টকার্ডকে

টেনে সরিয়ে নিলে দেখবে রঙ্গীন গরম জল উপরের বোতলে হাতীর শুঁড়ে মতন দুলে দুলে উপরের দিকে উঠছে। এর কারণ কী



বলো তো ? আসলে গরম জল ঠাণ্ডা জলের চাইতে হাল্কা। তাছাড়া গরম জলের আপেক্ষিক গুরুত্বও ঠাণ্ডা জলের চাইতে কম।

মাথা গরম ?

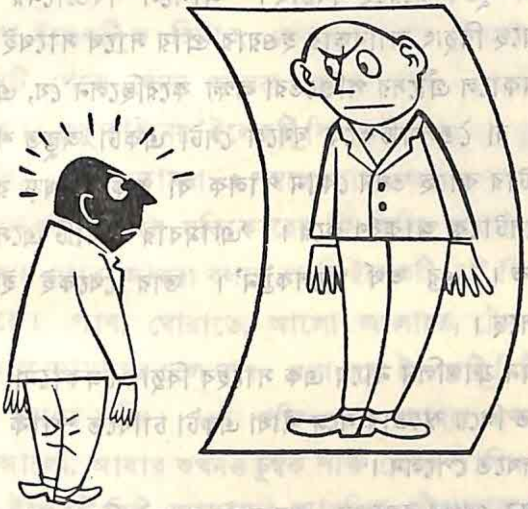
না, না, আমি সে রকম মাথা গরমের কথা বলছি না। আমি বলছি সত্যিকারের মাথা গরম—অর্থাৎ মাথায় হাত দিলে যে রকম গরম অনুভব করা যায়। এই এক্সপেরিমেণ্ট করতে হলে আমাদের চাই—একটা রিফ্লেক্টর। কাঁচের আয়না হলেই চলবে। আর অবশ্যই একটা......কি জিনিষ বলো তো ?

কি আবার, তোমার মাথা!

তোমরা সকলেই জানো, পরিবহনের সাহায্যে তাপ এক জায়গা

থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। একটা তামার তার হাতে নিয়ে তার একদিক আগুনে ধর। দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তার উল্টো দিক অর্থাৎ তুমি যে দিকে হাত দিয়ে রয়েছ—সেটা ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে। বেশীক্ষণ এইভাবে রাখলে তোমার হাতও পুড়ে যেতে পারে। তামার তারের মধ্যে দিয়ে তাপ খুব সহজেই সঞ্চালন করতে পারে। তাই এর অন্যদিকটা তাড়াতাড়ি গরম হয়ে ওঠে।

বিকীরণের সাহায্যেও তাপ স্থানান্তরিত হতে পারে। সূর্য থেকে আমরা যে তাপ পাই সেটা বিকীরিত তাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা বড় ইলেকট্রিক বাল্বের নীচে তোমার মাথা রেখে



বাল্বের সুইচটা অন্ করে দাও (লোড শেডিং-এর সময় নিশ্চয়ই নয়)। সঙ্গে সঙ্গে তুমি মাথায় গরমটা অনুভব করতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি সুইচ অন করার সাথে সাথে বাল্বে হাত দাও তাহলে দেখবে সেটা তখনও ঠাণ্ডা রয়েছে।

তোমার দেহ থেকেও তাপ বিকীরিত হচ্ছে। একটা ঠাণ্ডা ঘরে তুমি তোমার দেহ থেকে বিকীরিত এই তাপ অনুভব করে দেখতে পার। একটা ভাঙা কাঁচের আয়নার সামনে রোদে তেতেপুড়ে

এসে দাঁড়ালে পরিষ্কার বুঝতে পারবে ঐ রিফ্লেক্টর (আয়না) থেকে কেমন সুন্দর ভাবে তাপ বিকীরিত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ

গত একশো বছরে মানুষ বিজ্ঞানে যে এত উন্নতি করতে পেরেছে তার প্রধান কারণ কি বলতে পার?

রেডিও, টেলিভিসন, এরোপ্লেন, সিনেমা, এক্স-রে—সব কিছু আবিষ্কারের মূলে রয়েছে বিদ্যুৎ। আসলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে বিদ্যুৎ আবিষ্কার হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই।

প্রাচীনকালে গ্রীসের পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, এক টুক্‌রো 'এ্যামবার' বা তৈলস্ফটিককে ঘষলে সেটা একটা অদ্ভুত শক্তি লাভ করে। ওটার কাছে তখন কোন পালক বা শুকনো খড় রাখলে ঐ এ্যামবার সেটাকে আকর্ষণ করে। 'এ্যামবার' কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। এর অর্থ 'ইলেকট্রন'। তার থেকেই ইলেকট্রিক কথাটি এসেছে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক সাহেব বিদ্যুৎ-চমকানো আকাশে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে সুতোর সঙ্গে বাঁধা একটা চাবিতে স্পার্ক (বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ) দেখতে পেলেন।

ফ্রাঙ্কলিন এরপর বললেন—সব বস্তুর মধ্যেই বিদ্যুৎ রয়েছে, ঘষলে তাদের সক্রিয় অবস্থা দেখা যায়। এইসব বস্তুর কোনটিতে বিদ্যুৎ-কণা বেশী রয়েছে, কোনটিতে রয়েছে কম।

বিদ্যুৎ কতকগুলো বস্তুর মধ্যে দিয়ে সহজেই চলাফেরা করতে পারে। যেমন এলুমিনিয়াম, তামা, লোহা ইত্যাদি। এরা হচ্ছে 'কন্‌ডাক্‌টর'—বা বিদ্যুৎ পরিবাহী। যে জিনিষের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ মোটেই যেতে পারে না তাদের বলে—নন্‌-কনডাক্‌টর বা বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। এদের মধ্যে রয়েছে, রবার, শুকনো কাঠ,

প্লাস্টিক ইত্যাদি।

ইলেকট্রিসিটি কি তা ভালভাবে কিছু বুঝতে গেলে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

তোমরা জানো, মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় পরমাণু। এই পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরী। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বা নেগেটিভ চার্জ রয়েছে। প্রোটনের আছে ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জ। নিউট্রনের কোনও চার্জ নেই। ইলেকট্রিসিটিকে এক কথায় বলা যায়—ইলেকট্রনের প্রবাহ। যখন কোনও তার অথবা ধাতুর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তখন আমরা ইলেকট্রিক কারেন্ট পাই।

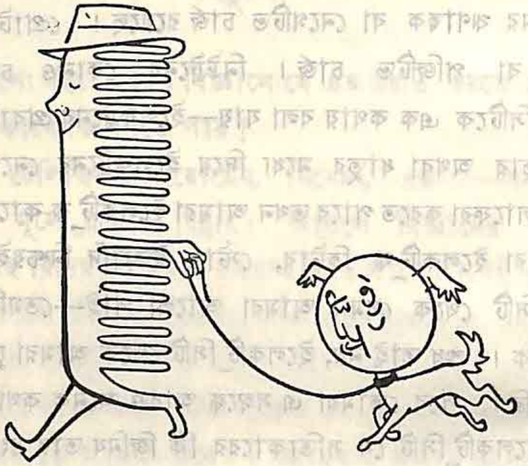
তোমরা ইলেকট্রিক হিটার, স্টোভ ইত্যাদি নিশ্চয়ই দেখেছ। ইলেকট্রিসিটি থেকে যেমন আমরা আলো পাই—তেমনি তাপও পেয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, ইলেকট্রিসিটি থেকে আমরা চুম্বক শক্তি পেতে পারি। পরে তোমরা এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানবে। আসলে ইলেকট্রিসিটি যে সত্যিকারের কি জিনিষ তার সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুস্কিল। তবে আমরা বলতে পারি ইলেকট্রিসিটি কি কি কাজ করতে পারে। পাখা ঘোরাতে, আলো জ্বালাতে, ট্রেন চালাতে, বিদ্যুৎ না হলে আমাদের চলে না। বলা চলে ইলেকট্রিসিটি তাহলে হচ্ছে এক ধরণের শক্তি। এই শক্তি থেকে আমরা কখনও তাপ, কখনও বা আলো, আবার কখনও চুম্বক শক্তি পেতে পারি।

যদিও ইলেকট্রিসিটি আমাদের আধুনিক জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য তবুও এটাকে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়—নইলে বিপদ।

চিরুনী আর পিংপং বল

এটা হচ্ছে স্থির বিদ্যুতের একটা মজার এক্সপেরিমেণ্ট। এই খেলা দেখাবার সময় মনে রাখতে হবে যেন আবহাওয়া বেশ

শুক্‌নো থাকে। শুক্‌নো আবহাওয়া বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি আবহাওয়া যেন স্যাঁতসেঁতে না হয়। শীতকালই হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্ট দেখানোর সবচেয়ে ভাল সময়। অবশ্য অন্য সময়েও যে এটা দেখানো যায় না এমন নয়।

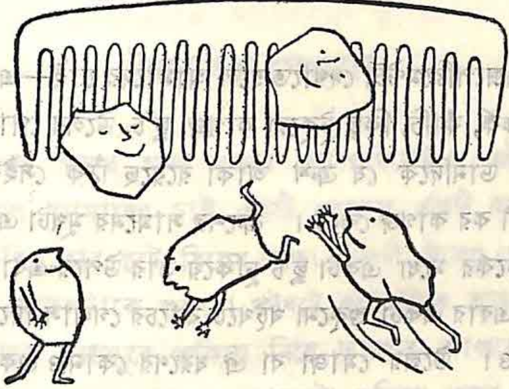


একটা চিরুনী নিয়ে তোমার চুলে অথবা কোনও উলের পোষাকে খুব জোরে বারে বারে ঘষ। এবার চিরুনীটাকে টেবিলের উপরে রাখা পিংপং বলটার কাছে নিয়ে এস। দেখবে পিংপং বলটা কেমন সুড়সুড় করে চিরুনীর দিকে এগিয়ে আসছে। চিরুনীটাকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাও, দেখবে বলটিও তার পিছু পিছু পোষা প্রাণীটির মতো গড়িয়ে চলেছে।

চিরুনী দিয়ে আরও একটা মজার খেলা দেখানো যায়। চিরুনীটাকে মাথায় ভালো করে ঘষে সেটা যদি টেবিলের উপর রাখা কয়েক টুকরো ছোট কাগজের উপর ধর, দেখবে, চুম্বকের মতো লাফ মেরে কাগজের কুচোগুলি চিরুনীর সাথে লেগে যাচ্ছে। চিরুনীতে স্থির বিদ্যুত সৃষ্টি হবার ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

আরও একটা মজার খেলার কথা তোমাদের বলছি। বাড়ীর

জলের কলের মুখটা এমনভাবে খুলে দাও যেন খুব সরু হয়ে জল পড়তে পারে। এইবার চিরুনীটাকে একটা উলের পোষাকে ঘষে



ওটা জলের ধারার কাছে নিয়ে এস। দেখবে, অবাক কাণ্ড, ঐ জলের ধারা কেমন সুন্দর ভাবে বেঁকে চিরুনীর দিকে আসছে।



চিরুনীর ভিতরের স্থির বিদ্যুতের টানের জন্যেই জলের ধারা এই-ভাবে বেঁকে ওটার কাছে এগিয়ে যেতে পারে।

ঘুরল শুধু ঘষার জোরে

এই এক্সপেরিমেণ্টটা দেখাতে হলে আমাদের চাই—একটা কাঁচের গেলাস, কর্ক, কাঁচি, কিছু টুক্‌রো কাগজ, ছুঁচ, উলের পোষাক।

ছবির ডানদিকে যে ক্রশ আঁকা রয়েছে ঠিক সেইরকম একটা ক্রশ তৈরী কর কাগজ কেটে। ক্রশের সামনের মুখটা একটু ছুঁচলো হবে। কর্কের মধ্যে একটা ছুঁচ ঢুকিয়ে তার উপরে এবার ক্রশটাকে বসাও। এবার একটা শুক্‌নো খট্‌খটে কাঁচের গেলাস দিয়ে কর্কটাকে ঢেকে দাও। উলের মোজা বা ঐ ধরণের কোনও একটা পোষাক



দিয়ে গেলাসের একদিক ঘষতে থাক। দেখবে অবাক কাণ্ড—কাগজের ক্রশের ছুঁচলো মুখটি তুমি গেলাসের যে দিকটায় ঘষছ তার ঠিক উল্টো দিকে ঘুরে যাবে। আস্তে আস্তে গেলাসটার চারপাশে ঐ উলের পোষাক দিয়ে ঘষতে থাকলে দেখবে ক্রশটাও কেমন সুন্দর ঘুরতে লেগেছে।

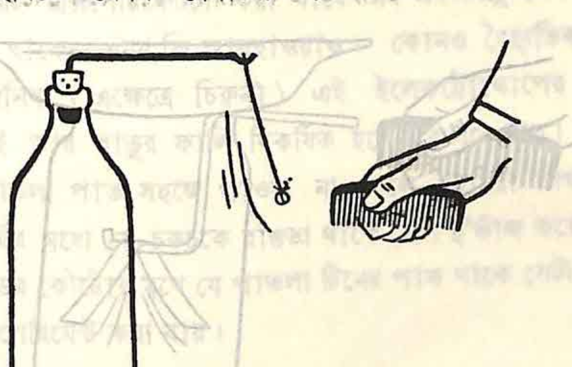
যদি ঐ ক্রশের উপর কাগজের তৈরী ছোট্ট একটা ঘোড়া

বানিয়ে আঠা দিয়ে আটকে দিতে পারো তাহলে দেখবে স্থির বিদ্যুতের টানে তোমার ঘোড়া কেমন সুন্দর বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে!

বৈদ্যুতিক পেণ্ডুলাম

এটি খুবই সুন্দর অথচ মজার এক্সপেরিমেণ্ট। এই খেলাটি দেখাতে হলে আমাদের চাই একটি বোতল, একটি বড় ও একটি ছোট কর্ক, কিছু তার, দুটো সিল্কের সূতো, চিরুনী, উলের পোষাক।

প্রথমে বোতলটাকে শুক্‌নো খট্‌খটে করে নিতে হবে। এজন্য প্রথমে ওটাকে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে তারপর আগুনের ওপরে সাবধানে কিছুক্ষণ ধরতে পার। বোতলটা শুকিয়ে গেলে ওর মুখটা ছিপি দিয়ে বন্ধ কর। এবার ঐ ছিপির মধ্যে একটা সরু তার ঢুকিয়ে ওটাকে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে লাগাও।



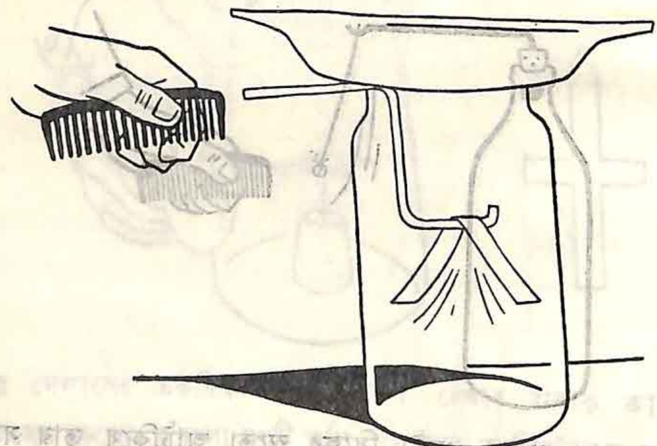
তারের শেষ প্রান্তে একটা সিল্কের সূতো আটকিয়ে তার সাথে শুক্‌নো কর্কের খানিকটা টুকরো কেটে বেঁধে দিতে হবে। তোমার পেণ্ডুলাম তৈরী হয়ে গেল। এবার চিরুনীটাকে উলের পোষাকে ঘষে নিয়ে ওটাকে শোলার পেণ্ডুলামের কাছে নিয়ে এস। দেখবে শোলার টুকরোটা চিরুনীর আকর্ষণে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু শোলাটা চিরুনীকে স্পর্শ করে এবং তার থেকে কিছু বিদ্যুৎ নিয়ে নেবার পর ওটার থেকে দূরে সরে গিয়ে পেণ্ডুলামের মত দুলতে আরম্ভ করবে।

তারের শেষপ্রান্তে পাশাপাশি আরও একটা সিল্কের সুতোর সাথে কর্কের টুকরো বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। এবার চিরুনী দিয়ে দুটো কর্কের টুকরোতেই চার্জ দিলে দেখবে—তারা একই প্রকৃতির বিদ্যুৎ পাবার ফলে পরস্পর বিকর্ষিত হচ্ছে—অর্থাৎ দূরে সরে যাচ্ছে। এটা সত্যি সত্যিই ভারী মজার এক্সপেরিমেণ্ট—তাই না?

হাতে তৈরী ইলেকট্রোস্কোপ

ডিংকুকে যখন তার ছোটমামা জিজ্ঞাসা করলেন—কত রকমের স্কোপ আছে বলো তো, ও তখন গরগর করে বলে যেতে লাগল—



মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ, বায়োস্কোপ, স্টেথিস্কোপ, ফুটোস্কোপ··· বলেই ডিংকু আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল—

"আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।"

ছোটমামা বললেন—থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে আর বলতে হবে না। আমি তোমাকে একটা নতুন স্কোপ শেখাচ্ছি—ইলেকট্রোস্কোপ। এটা হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যা দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জ টেস্ট করা যায়।

তৈরী করবে নাকি তোমরা নিজের হাতে এমন একটা ইলেকট্রোস্কোপ? প্রথমে একটা তামার তারকে ইংরাজী Z অক্ষর-এর মতন করে বেঁকিয়ে নাও। এইবার ঐ তারের নীচের অংশে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম একটা খুব পাতলা ধাতুর ফালি দু'ভাঁজ করে রাখ। তামার তারের উপরের অংশটা একটা শুকনো কাঁচের জারের মুখে রাখতে হবে। এইবার একটা এলুমিনিয়ামের প্লেট দিয়ে জারের মুখ ঢেকে দাও। এখন যদি তুমি এলুমিনিয়ামের প্লেটের কাছে একটা চিরুনী (মাথায় ঘষে নিয়ে) ধর তাহলে দেখবে ধাতুর ভাঁজ করা ফালি দু'পাশে দূরে সরে যাচ্ছে। অবশ্য এই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাবে যদি সব কিছু বেশ শুকনো অবস্থায় থাকে—এমন কি আবহাওয়াও। কোনও বৈদ্যুতিক চার্জ-যুক্ত জিনিষ (এক্ষেত্রে চিরুনী) এই ইলেকট্রোস্কোপের কাছে আনলেই তার ধাতুর ফালি বিকর্ষিত হয়ে দূরে সরে যায়। ধাতুর তৈরী পাতলা পাত সহজে পাওয়া না গেলে তোমরা সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে যে চকচকে রাঙতা থাকে সেটা দু'ভাঁজ করে অথবা বেবীফুডের কৌটোর মুখে যে পাতলা টিনের পাত থাকে সেটা দিয়েও এই এক্সপেরিমেন্ট করা যায়।

—



জন্ম : ১৮ই জানুয়ারী ১৯১৪ সন, কৃষ্ণনগর শহরে।
লেখাপড়া : কৃষ্ণনগর গভর্মেণ্ট কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণশাস্ত্রের পি-এইচ· ডি·। অধ্যাপনা শুরু করেন ১৯৬৪ সনে প্রথমে মৌলানা আজাদ কলেজে। পরে কোলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও কৃষ্ণনগর গভর্মেণ্ট কলেজে।

পার্থসারথি চক্রবর্তী যে খুব বেশীদিন সাহিত্য রচনা করেছেন এমন নয়। তবু এরই মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলা কিশোর সাহিত্যের অতি প্রিয় ও অপরিহার্য একটি নাম। বিজ্ঞানের রহস্যকে ছোটদের কাছে গল্পের মতো মনোগ্রাহী করে তুলতে তাঁর রচনার তুলনা মেলা ভার। তাছাড়া বিষয়বস্তুকে কৌতূহলকর, আকর্ষণীয় ও মজাদার করে তুলতে হয় কোন্ যাদুতে—তাও তাঁর অজানা নয়।

দীর্ঘদিন অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় সরস করে বিজ্ঞানের কাজের কথা লিখবার দিকেই তাঁর ঝোঁকটা বেশী। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের উপর ছোটদের জন্য সরস করে লেখা নির্ভরযোগ্য বই এমনিতেই দুর্লভ। পার্থসারথি চক্রবর্তী যে শুধু সেই অভাব পূরণ করে চলেছেন তাই নয়—তাঁর কলমের গুণে সেই লেখা হয়ে ওঠে কখনও ম্যাজিকের মতো, কখনও আজব কাহিনীর মতো অথবা মজার খেলার মতো চিত্তাকর্ষক। ছোটদের মহলে তাই তাঁর বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তাঁর লেখা কয়েকটি বিখ্যাত বই : 'কেমিক্যাল ম্যাজিক', 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা', 'রসায়নের ভেল্কি', 'ম্যাজিকের মতো মজা', 'তত সহজ ছিল না'।

বৃটিশ গভর্মেণ্টের ফেলোসিপ নিয়ে গ্রেট বৃটেন ও ইউরোপের বহু দেশ ঘুরে এসেছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা UNICEF-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগে সহ-শিক্ষা অধিকর্তার পদে নিযুক্ত আছেন।